দারসে কুরআন সিরিজ-২৯

শহীদে কারবালা

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-২৯

শহীদে কারবালা

রক্তাক্ষরে লেখা এক ফতোয়া

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

শহীদে কারবালা
খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক ঃ
খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির
খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

প্রকাশকাল ঃ
প্রথম প্রকাশ ঃ মে, ২০০৪
পঁচিশতম প্রকাশ ঃ এপ্রিল, ২০১৪

©
প্রকাশক

প্রচ্ছদ
আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ ঃ
আল-আকাবা প্রিন্টার্স
৩৬ শিরিশদাশ লেন,
ঢাকা-১১০০।

মূল্য ঃ ৫০.০০ (পঞ্চাশ) টাকা মাত্র।

www.pathagar.com

আলোচ্য বিষয় ঃ

১। উদ্দেশ্য

২। যাদের উদ্দেশ্যে লেখা

৩। স্যাটানিক ভার্সেস ও বিষাদ সিন্ধুর পার্থক্য–

৪। চিন্তার বিষয়–

৫। ভূমিকা–

৬। ঈমানের দাবী ও প্রথম দারস–

৭। ইসলামের চিন্তা–

৮। ইল্‌ম্‌ গোপন করার অনিষ্টতা–

৯। বিষাদ সিন্ধুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস–

১০। ইংরেজদের মাথা ব্যথার কারণ–

১১। বিষাদ সিন্ধু কারবালার ঘটনা সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছে–

১২। ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা–

১৩। কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার সঠিক কারণ–

১৪। ইমামের স্বপ্ন–

১৫। জান বাঁচান কি ফরয–

১৬। ইমাম হুসাইনের (রা) ফতোয়া–

১৭। ফতোয়ার ফলাফল–

১৮। যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তারা মরে না–

১৯। শহীদদের বারযাখী জীবন

২০। শহীদদের মৃত দেহ কি পঁচতে পারে?

২১। শহীদগণ জীবিত এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা রুজী পায়–

২২। জীব দেহ সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা–

২৩। আমাদের দুনিয়ার বসতির হাকিকত–

২৪। বারযাখী জীবনের আরো কিছু যুক্তিগ্রাহ্য– কথা

২৫। কারবালার ঘটনার পরবর্তী অবস্থা–

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্যে ঃ

* যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান–
* যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না–
* যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন–
* যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না–
* যারা ইমাম, খতীব, মুসল্লিরা যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

* ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা–
* সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা–
* সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি–
* অল্প মূল্যে অধিক পরিবেশন–

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

* দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো–
* লক্ষ কোটি ঘুমন্ত শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা

উদ্দেশ্য, কারবালার শিক্ষা শেখানো,
যা অনেকেই জানে না এখনো

কারবালার শিক্ষা

কারবালার শিক্ষা তো নয়, দল বেধে রথ চালানো।
নয় হায় হোসেন হায় হোসেন বলে বুক চাপড়ানো।।
সেতো রক্ত দিয়ে লেখা এক ফতোয়া– যা মুছবে না কখনো।
যে লেখা কারবালার মাঠে জ্বল জ্বল করে জ্বলছে এখনো।।
তাহলো খিলাফাত ছাড়া– ইসলাম মানে না কোনো শাসন।।
হে হতভাগা মুসলমান– তোমরা কি তা বুঝবে না এখনো?
দুনিয়ার শান্তি পরকালের মুক্তি, যদি চাও কখনো।
তবে শহীদি জামায়াতে যোগ দাও, সময় আছে এখনো।।
হে ইয়াজিদের গোষ্ঠী, তোমরা মরবে না কি কখনো।
হে সন্ত্রাসী গোষ্ঠী, তোমাদের দম্ভ চলবে কি তখনো?

www.pathagar.com

স্যাটানিক ভার্সেস ও বিষাদ সিন্ধুর পার্থক্য–

স্যাটানিক ভার্সেস লেখা ইসলামকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে আর বিষাদ সিন্ধুও লেখা ইসলামকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে। এ বিচারে এ দুটো বইয়ের মধ্যে (উদ্দেশ্যের দিক দিয়ে) কোনো পার্থক্য আছে বলে আমি মনে করি না। তবে ভাষা ও উপস্থাপনার ব্যাপারে রয়েছে বেশ পার্থক্য। স্যাটানিক ভার্সেসের ভাষা বইয়ের নামকরণ থেকে শুরু করে শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত অশালিন, ভদ্রতা ও রুচি বিবর্জিত এবং ইসলামী চেতনায় প্রত্যক্ষ আঘাতজনিত। আর বিষাদ সিন্ধুর ভাষা হল এমন এক ক্যাপসুলের মতো যার ভিতরে রয়েছে এমন বিষ যা ইসলামী চেতনাকে একেবারে ধ্বংস করে দেয়ার মতো কিছু উপরে এমন ক্যাপ লাগান যে, মিষ্টি এবং মন ভুলানো ভাষার আবরণ দিয়ে মূল বিষয়কে ঢেকে দেয়া কিন্তু সে বিষ এমন যে, যতই তার উপরে ক্যাপ লাগান হোক না কেন, মগজে বিষক্রিয়া করবেই। যা সুষ্ঠভাবে করেছে যা আমরা স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছি। আমরা এ ছোট্ট আলোচনা থেকে আশা করি সবাই তা বুঝতে সক্ষম হবেন।

এতে আরো পাবেন–

জান বাঁচান ফরয নয়, বরং প্রয়োজন হলে জান দেয়া ফরয। যে ফরয পালন করেছিলেন রাসূলের নাতি হযরত হুসাইন (রা) তাঁর নিজের জীবন দিয়ে। এ হুকুম আল কুরআনের কোথায় আছে তা এতে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

www.pathagar.com

চিন্তার বিষয়

বিষাদ সিন্ধু পড়ে কেউই বুঝতে পারবে না যে, ইমাম হুসাইন (রা) কারবালার মাঠে তাঁর গায়ের সবটুকু রক্ত ঝরিয়ে তা দিয়ে লিখে গেছেন এক অমোচনীয় ফতোয়া। যে ফতোয়া রক্ত রাঙ্গা অক্ষরে কারবালার মাঠে এখনো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

কারণ কি ছিল এ ফতোয়ার?

কারণ তো একটাই ছিল যে, অনাগত ভবিষ্যতের মুসলমানদের জানিয়ে দিয়ে যাওয়া যে, ইসলাম খিলাফাত ছাড়া অন্য কোনো ধরনের রাষ্ট্রব্যবস্থা মানে না, মানতে পারে না। তা রাজতন্ত্রই হোক আর মানব রচিত যে কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই হোক।

আর সে ফতোয়ার মধ্যে আরো লেখা রয়েছে যা বিবেকবান মুসলমানদের চোখে দূরবীণ লাগিয়ে দেখতে হবে। তা হচ্ছে ইসলামী শাসন বা খিলাফত এবং সৎলোকের শাসন কায়েমের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন হলে জীবন দাও কিন্তু বেহেশতী মুসলমান হয়ে যদি বাঁচতে চাও তবে মানুষের মনগড়া আইনের কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই মেনে নিও না, কারণ তাতে ইসলামের পথে চলতেও পারবে না এবং পরকালে বেহেশতও পাবে না। আর তাতে ভোগ করতে হবে দুনিয়াতে চরম অশান্তি এবং পরকালে ভীষণ শাস্তি। এ ঘটনাই হচ্ছে রক্তাক্ষরে কারবালার মাঠে লিখে যাওয়া ফতোয়ার আসল কারণ। চিন্তাশীল দীন দরদী ভাই ও বোনেরা এটার উপর একটু চিন্তা করে দেখবেন কি?

www.pathagar.com

ভূমিকা

কারবালার ঘটনা ঘটে রাসূল ﷺ ইহজগত ত্যাগ করার পরে। কাজেই কারবালার ঘটনা আল কুরআনে নেই। কাজেই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, কারবালার ঘটনা কি করে দারসে কুরআনের মধ্যে আসতে পারে? প্রশ্নটা একেবারেই স্বাভাবিক। কাজেই এ প্রশ্নের উত্তরটা পূর্বেই দিয়ে নেয়া দরকার মনে করেই এ প্রশ্নটার উত্তর দিচ্ছি।

শুধু কারবালার ঘটনাই নয়, একেবারে কিয়ামত পর্যন্ত যত প্রকার ঘটনা ঘটতে পারে বা যা ঘটবে তার প্রত্যেকটি ঘটনা যখন মুসলমানদের সামনে এসে হাজির হবে তখন মুসলমানদের কি ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে তার সব কিছুই আল কুরআনে পূর্ব থেকেই বলে দেয়া আছে। কাজেই কারবালার মতো অবস্থা সামনে আসলে মুমিন মুসলমানদের ভূমিকা কি হবে তা আল্লাহ পূর্বেই বলে রাখতে বাদ পড়ার কথা নয়। এ আকীদা আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই পুরা মাত্রায় আছে। প্রয়োজন শুধু কোনো সমস্যা সামনে এসে পড়লে ইমাম হুসাইন (রা)-এর সামনে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল কারবালার মাঠে। তার সমাধান খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি আল কুরআনে। কাজেই কুরআনের সমাধান মুতাবিক তিনি স্থির মস্তিষ্কে সুস্থ মনে বা খোলা মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ছিলেন যে, এ মুহূর্তে ইসলামের জন্যে জীবন দেয়াই ফরয হয়ে পড়েছে। তাই সুস্থ মাথায় খোলা মনে (তিনি খুশী খোশালিত মনে) কারবালার মাঠে জীবন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েই তাবু থেকে বেরিয়ে আসেন এবং পরিবারের লোকদের বলে বেড়ান যে, আমার চেহারা তোমরা দুনিয়ার জীবনে শেষবারের মতো দেখে নিচ্ছ। এর পরে দেখা হবে আর কিয়ামতের মাঠে। এর পূর্বে তোমাদের আমি এ দুনিয়ার চর্ম চোখে আর দেখব না। এটা বলার পরেই ১০ই মুহাররম তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে যান। এরপরে পরবর্তী কথাগুলো মনোযোগ সহকারে পড়ুন। এবং দেখুন কারবালার ঘটনাকে যেভাবে বিষাদ সিন্ধুতে দেখান হয়েছে। সেটাই কি মূল ঘটনা, নাকি অন্য কিছু এবং এটাও বিবেচনা করবেন যে, আমি বিষাদ সিন্ধুকে স্যাটানিক ভার্সেসের সাথে তুলনা করেছি। আমার কথার যৌক্তিকতা

www.pathagar.com

আমার পরবর্তী আলোচনায় পাওয়া যাবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস। কিন্তু আমার কথা ঠিক না বেঠিক তার বিচার করার দায়িত্ব পাঠক- পাঠিকাদের।

আমি আশা করি আমার মেহেরবান আল্লাহ আমার নেক আশা পূরণ করবেন এবং কারবালার সঠিক ঘটনা থেকে শিক্ষাগ্রহণের তৌফিক দান করবেন তার বান্দাদের।

ইতি

লেখক

www.pathagar.com

ঈমানের দাবী

ঈমানের দাবী কী? এ বিষয়ে দেখুন কুরআনে কি বলে এবং ঈমান কখন মুমিনের জীবন দানকে ফরয করেছে ঃ তা পড়ুন নিম্নের আয়াতগুলো থেকে।

(٢٥) فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتَّى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَيَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ـ

(٢٦) وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ اَوِ اخْرُجُوْا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوْهُ اِلاَّ قَلِيْلٌ مِنْهُمْ وَلَوْ اَنَّهُمْ فَعَلُوْا مَا يُوْعَظُوْنَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاَشَدَّ تَثْبِيْتًا ـ

সূরা নিসা– ৬৫ ও ৬৬ নং আয়াত।

অনুবাদ ঃ না, হে মুহাম্মদ আমি তোমার রবের নামের কসম করে বলছি, তারা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না– যতক্ষণ না তারা তাদের পারস্পরিক মতবিরোধের বিষয়গুলোর ব্যাপারে তোমাকে চূড়ান্ত বিচারক হিসাবে মেনে নেবে। অতপর তুমি যা-ই ফায়সালা করে দেবে তা মেনে নিতে তাদের মনে কিছুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করবে না। বরং তার সামনে নিজেদেরকে সম্পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে এবং তোমার ফায়লাসা খুশী মনে মেনে নেবে। আর আমি যদি তাদের উপর ফরয করে দিতাম যে তোমরা ইসলামের জন্য নিজেদের জীবনকে কতল করে দাও অথবা ঘর বাড়ি ছেড়ে হিজরাত করে যাও তবে তাদের মধ্যে খুব কম লোকই এ ফরয বা এ হুকুম মানত (মানত বটে কিন্তু খুব কম লোক) অথচ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের যদি এরূপ হুকুম করা হয় বা নসিহত করা হয় আর যদি সেই নসিহত অনুযায়ী আমল করে অর্থাৎ জীবনদান ও ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার মতো অবস্থায় ঘর ছেড়ে চলে যায় ও জান দেয়ার মতো অবস্থায় জান দেয় তবে তা হয় তাদের জন্যে অধিকতর কল্যাণকর ও ঈমানের উপর দৃঢ়তার কারণ।

শব্দার্থ ঃ فَلاَ অতএব না وَرَبِّكَ তোমার রবের কসম করে বলছি অর্থাৎ আল্লাহ তার জাতপাকের কসম করে বলছেন। لاَيُؤْمِنُوْنَ তারা ঈমানদার নয় বা ঈমানদার হতে পারে না حَتَّى যতক্ষণ না পর্যন্ত يُحَكِّمُوْكَ তোমাকে বিচারক মানে বা তোমার বিচার মেনে নেয়। فِيْمَا যেসব বিষয়ে شَجَرَ بَيْنَهُمْ তাদের

www.pathagar.com

মধ্যে মতবিরোধ হয় ثُمَّ পরে لاَ يَجِدُ পাবে না فِىْ اَنْفُسِهِمْ তাদের মনের মধ্যে حَرَجًا কোনো প্রকার কুণ্ঠাবোধ مِمَّا قَضَيْتَ তুমি যা বিচার ফায়সালা করে দেবে وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا তা তারা মেনে নেবে খুশী মনে। وَلَوْ আর যদি كَتَبْنَا আমি ফরয করে দিতাম عَلَيْهِمْ তাদের উপর اَنِ اقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ যে কতল হয়ে যাও বা নিজের জানকে বিলিয়ে দাও (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) اَوْ অথবা اخْرُجُوْا বের হয়ে যাও مِنْ হতে دِيَارِكُمْ তোমাদের ঘরবাড়ী مَا فَعَلُوْهُ তা কেউ মানত না اِلاَّ। কিন্তু قَلِيْلٌ খুব কমসংখ্যক مِنْهُمْ তাদের ভিতর থেকে وَلَوْ اَنَّهُمْ আর তারা যদি অবস্থার দাবী فَعَلُوْا পালন করে مَا যা يُوْعَظُوْنَ بِهِ যার প্রতি তাদের নসিহত করা হয় مَا كَانَ خَيْرًا তা হয় অতি উত্তম বা কল্যাণকর কাজ لَهُمْ তাদের জন্যে وَاَشَدَّ এবং অধিকতর تَثْبِيْتًا ঈমানের উপর দৃঢ় থাকার কারণ।

ব্যাখ্যা ঃ এর ব্যাখ্যা যেহেতু আমার লেখা ঈমানের দাবী ও মুমিনের পরিচয় নামক ৬নং দারসে কুরআন সিরিজের মধ্যে একবার দেয়া হয়েছে তাই এখানে অনুবাদই যথেষ্ট মনে করছি। আগের অনুবাদ থেকেই স্পষ্ট বুঝা গেছে যে, প্রয়োজনে জান বাঁচান নয় বরং জান দেয়া ফরয এবং ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়াও কখনো কখনো ফরয হয়ে পড়ে। যার দুটি ফরযই অর্থাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে পড়া এবং জীবনদান করা এ দুই ফরযই হযরত হুসাইন (রা) পালন করেছিলেন কারবালার মাঠে। এবার বলতে চাই কারবালার আসল ঘটনা। তবে তার পূর্বে বিষাদ সিন্ধু সম্পর্কে ২/১টি কথা বলে নেয়া দরকার মনে করেই বিষাদ সিন্ধু সম্পর্কে পূর্বে কিছু বলে নিতে চাই। তার পর পরই বলতে চাই কারবালার মাঠে রক্তাক্ষরে লেখা ফতোয়ার বিবরণ। ইমাম হুসাইন (রা) অনেক বিষয়ে চিন্তা করেছেন। কুরআনের অনেক স্থানের অনেক আয়াতের কথা তাঁর মনে পড়েছিল যার ২/১টা এখানে উল্লেখ করছি। তাঁর মনে পড়েছিল সূরা কাহফের শেষ আয়াতের কথা, যেখানে আল্লাহ বলেছেন ঃ

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحًا وَّ لاَ يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا ـ

"অতএব যে ব্যক্তি তার নিজের রবের সাথে দেখা করার আশা করে সে যেন নেক আমল করে এবং আল্লাহর দাসত্ব, তাঁর বন্দেগী এবং আইন-কানুন মেনে চলার ব্যাপারে সে যেন তাঁর নিজের রবের সাথে অন্য কাউকে শরীক না করে।" অর্থাৎ মানুষ তাঁর জীবনের ব্যক্তিগত দিক থেকে শুরু করে তার পারিবারিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, যুদ্ধ, সন্ধি, চুক্তি, শিক্ষা, জ্ঞান-বিজ্ঞানের

www.pathagar.com

চর্চা এর কোনোটাই আল্লাহর আইনের খেলাপ কিছু করা বা মেনে নেয়া এ আয়াতের খেলাফ। তাই ইমাম হুসাইন (রা) চিন্তা করলেন, আমি ইয়াজিদকে খলিফা বলে স্বীকার করলে উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যে নির্দেশ দিয়েছেন তার সম্পূর্ণ খেলাফ কাজ করা হবে। কিন্তু আমি এ বিষয়ে যখন আল-কুরআন থেকে জেনেছি তখন এ জানাকে আমি কি খেলাফ করতে পারি এবং আমি কি এমন এক ব্যবস্থা চালু হওয়ার ফতোয়া দিতে পারি যাতে মুসলমানরা কোনো দিনও সূরা কাহাফের উক্ত আয়াতাংশের নির্দেশ পালন করতে পারবে না। এমনকি কিয়ামত পর্যন্তও ঐ আয়াত শুধু কুরআনে কালি দিয়ে লেখাই থাকবে। মানুষ কোনো দিনও ঐ আয়াতের উপর আমল করতে পারবে না যদি ইয়াজিদকে খলিফা বলে মানি।

(২) মনে পড়েছিল সূরা নাসের ঐ তিনটি কথা যে আল্লাহই হচ্ছেন সব মানুষের রব, সব মানুষের বাদশাহ এবং সব মানুষের ওপর সার্বোভৌমত্বের মালিক, যে কথাটা বলা হয়েছে নিম্নের ভাষায়– যথা ঃ

একমাত্র আল্লাহই হচ্ছেন رَبِّ النَّاس مَلِك النَّاس اله النَّاس কাজেই ইয়াজিদকে খলিফা বলে স্বীকার করলে উক্ত আয়াতটা শুধু কুরআনেই কালির দাগে লেখা থাকবে মাত্র, কিন্তু মুসলমান আর জীবনেও কিয়ামত পর্যন্ত কোনো দিনও একমাত্র আল্লাহকে সব মানুষের উপর মালিক বলে মানার পরিবর্তে তারা তাদের রাষ্ট্রপ্রধানকেই মনে করবে যে রাষ্ট্রপ্রধানই (একজন মানুষই আল্লাহর পরিবর্তে) সব মানুষের প্রভু প্রতিপালক। রাষ্ট্রপ্রধানই সব মানুষের বাদশাহ বা সব মানুষের ওপর সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী এবং মানুষ রাষ্ট্রপ্রধানই হবে সব মানুষের মুনিব আইনদাতা, হুকুম কর্তা এবং রাষ্ট্রপ্রধানই হবে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক। আল্লাহ আর মানুষের বাস্তব জীবন যাপনের ক্ষেত্র رَبِّ النَّاس مَلِك النَّاس اله النَّاس থাকতে পারবেন না, (৩) মনে পড়েছিল আল্লাহ ১৪৭ বার আল কুরআনে ইলাহ শব্দ ব্যবহার করে মানুষকে কি বুঝাতে চেয়েছেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ যা বলেছেন তা কি আল কুরআনেই লেখা থাকবে না কি মানুষের বাস্তব জীবনের সাথে তাঁর কোনো সম্পর্ক থাকবে।

(৪) মনে পড়েছিল রবের সঠিক অর্থ বুঝতে গিয়ে আল্লাহ আল কুরআনে ৯৭৮টা আয়াত নাযিল করে মানুষকে রব সম্পর্কে কি বুঝ দিতে চেয়েছেন। এবং আল্লাহকে কিভাবে রব বলে মানতে বলেছেন। হযরত ইমাম হুসাইন (রা) দেখছিলেন রব সম্বলিত আয়াতগুলো কুরআনেই লেখা থাকবে এবং গিলাফ

www.pathagar.com

দিয়ে ঢেকে রাখা হবে, মানুষ আর কোনো দিনও এর তাৎপর্য বুঝবে না এবং মানুষ কিয়ামত পর্যন্ত সত্যিকার অর্থে মানুষকেই রব বলে মানবে যদি আমি রাজতন্ত্রের স্বীকৃতি দেই।

(৫) মনে পড়েছিল আল কুরআনের সেই আয়াত যেখানে كِتْمَان علم বা নিজের অর্জিত ইল্‌মকে গোপন করে গেলে তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ কি বলেছেনঃ যে কথা সূরা বাকারার ১৫৯নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ ـ اُولٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ـ

"অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন "যারা আমার (অহির মাধ্যমে) নাযিল করা উজ্জ্বল আদর্শ ও ব্যবস্থা গোপন করে রাখবে অথচ আমি তা (আমার নাযিল করা কিতাবে) দুনিয়ার সমস্ত মানবগোষ্ঠীর সঠিক পথপ্রদর্শনের জন্যে আমার নিজ কিতাবে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। নিশ্চিতই জেনে রেখ আল্লাহ তাদের উপর লা'নত করছেন আর অন্যান্য সকল লা'নতকারীরাও তাদের উপর লা'নত বান নিক্ষেপ করছে।" (আল কুরআনে) এখানে স্পষ্ট আল্লাহ বলে দিচ্ছে যার যেটুকু দীনি ইল্‌ম আছে তা যদি সে গোপন করে তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত এবং লা'নতকারী হিসাবে কোনো জাতির কথা উল্লেখ কুরআন ও রাসূলের হাদীসের যেটুকু ইল্‌ম রয়েছে তা গোপন করলে যারাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে তাদের প্রত্যেকেই ঐ গোপনকারী আলেমকে লা'নত করবে। অর্থাৎ আলেম যদি তার ইল্‌মকে জানের ভয়ে বা কোনো স্বার্থের কারণে গোপন করে তাহলে এ গোপন করার কারণে যারাই ইহকাল ও পরকালের জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তারা কিয়ামতে প্রত্যেকেই ঐ আলেমের বিরুদ্ধে আল্লাহর সর্বোচ্চ আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় যে শুধু আসামী হয়ে দাঁড়াতে হবে তাই নয় বরং তাঁদের প্রত্যেকের অভিসম্পাতের আঘাতে এসব ইল্‌ম গোপনকারী আলেমদের অবস্থা হবে সাধারণ গোনাহগারদের তুলনায় অনেক গুণ বেশী শোচনীয়। হযরত ইমাম হুসাইন (রা) মনে মনে ভেবে দেখলেন আমি কি রাষ্ট্র পরিচালনা সম্পর্কে যে ইল্‌ম রাখি তা কি জান বাঁচানোর জন্যে গোপন করতে পারি, ভাবলেন, না তা আমি পারি না, অতপর তার দেহের সবটুকু রক্ত কারবালার মাঠে ঢেলে দিয়ে তার জানা ইল্‌মকে গোপন না করে প্রকাশ করে দিলেন, যে ইলমের প্রকাশ করতে গিয়ে তিনি জীবন রক্ষা করতে পারেননি। কারণ তিনি আল্লাহ ও দুনিয়ার সমস্ত সৃষ্টি বস্তু ও সৃষ্টজীবের (মানবজাতি সহ) লা'নত কুড়াতে

www.pathagar.com

চাননি, তিনি চেয়েছিলেন তার জানা ইল্‌মকে প্রকাশ করে দিতে এবং আলেমদের জন্যে একটা দৃষ্টান্ত রেখে যেতে, যেন প্রয়োজন হলে দুনিয়ার তামাম আলেম জান দিয়েও তাঁদের জানা ইল্‌মকে দুনিয়ার সামনে প্রকাশ করে।

ইল্‌ম গোপন করায় ক্ষতিগ্রস্থ হয় কারা

ইল্‌ম গোপন করাতে কারা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার পুরা তালিকা প্রণয়ন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, তবে একটা কাছাকাছি অনুমান করার জন্যে অল্প কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। যথা ঃ

(১) আজ বাংলাদেশে আড়াই লাখ ইমামসহ ছোট বড় দিয়ে কম হলেও ১০ লাখ আলেম কুরআন হাদীসের যা জ্ঞান রাখেন তা যদি তারা গোপন না রাখতেন তাহলে বাংলার ১৩ কোটি মানুষের ইমাম তারাই হতে পারতেন। তাঁদের জানা ইল্‌ম গোপন করার কারণে আজ প্রায় ১০ লাখ আলেম গোষ্ঠীর ইমাম একজন বে-আলেম মহিলা। তাঁরা যদি তাঁদের জানা ইলম গোপন না রাখতেন, তাহলে দেশের চেহারা ভিন্নরূপ হতো। এটা কি অস্বীকার করবেন? বগুড়ার আবদুল মালেকের ন্যায় যদি ১০ লাখের অন্ততঃ ১ ভাগ আলেম ও ইমাম হুসাইন (রা)-এর ন্যায় এবং ঐ জামানার আবদুল মালেক ও তাদের সহগামী শহীদদের ন্যায় রক্ত দিয়ে আপনাদের জানা ইলমকে বাংলার মুসলমানদের সামনে প্রকাশ করে দিতেন, তাহলে–

(১) শিক্ষাঙ্গন ক্রু ক্ষেত্রে পরিণত হতো না–

(২) পুরুষদের ইমাম মহিলা হতো না–

(৩) চুরি ডাকাতি রাহাজানি ছিনতাই ধর্ষণ ইত্যাদি জাতীয় কোনো দুর্ঘটনা খবর আসতো না।

(৫) খবরের কাগজ খুললেই মানুষের হাতে নিষ্ঠুরভাবে নিহত হওয়ার, পিতার হাতে সন্তান নিহত হওয়ার, স্বামীর হাতে স্ত্রীর নিহত হওয়ার, স্ত্রীর হাতে স্বামী নিহত হওয়ার, মহিলাদের রাস্তায় ধরে গহনা ছিনিয়ে নেয়ার এবং তাদের ইজ্জত হরণ করার, কাজের মেয়েদের মারতে মারতে মেরে ফেলে দেয়ার, আন্দাজে দোষী সাব্যস্ত করে নিরিহ সৎলোকদের পুলিশি নির্যাতন ও কোনো

www.pathagar.com

স্থলে পুলিশের পিটুনিতে নিরিহ মানুষ মরে যাওয়ার, খুনি কেসের আসামীদের সাথে বড় দলের নেতা- নেত্রীদের বৈঠকের খবর আসতো না। যারা মার খেয়ে মরে তাদেরই আসামী হওয়ার খবর, ব্যাংক ডাকাতীর খবর, মাস্তানদের হাতে নিরিহ লোকদের জিম্মি হওয়ার খবর, জান মালের ও মান ইজ্জতের নিরাপত্তাহীনতার খবর ইত্যাদি ধরনের একটা খবরও খবরের কাগজে আমাদের পড়তে হতো না। এসব পড়তে হয় একমাত্র ওলামা সম্প্রদায়ের জানা ইল্‌ম গোপন করা এবং ইসলামের চেয়ে দুনিয়ার জীবনে মান মর্যাদা ও স্বার্থকে বড় করে দেখা। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) তা দেখেননি। তিনি ইসলামকেই বড় করে দেখেছেন জীবনের চেয়েও।

(৬) ইল্‌ম গোপন না করে যদি কুরআন হাদীসের শিক্ষা আমরা সম্মিলিতভাবে সমাজের সামনে তুলে ধরতে পারতাম তাহলে শুধু মানুষই নয় একটা জীব জানোয়ারও কষ্ট পেত না, কোনো গাছ পালাও কষ্ট পেত না, আমরা প্রয়োজনে গরু জবাই করে খাই কিন্তু বিনা কারণে কোনো একটা প্রাণীকেও কষ্ট দেয়ার হুকুম কুরআন হাদীসে নেই। বরং তাদের সুবিধার দিকেও নজর রাখার নির্দেশ রয়েছে। বিনা প্রয়োজনে রাসূল ﷺ গাছের পাতাও ছিড়তে নিষেধ করেছেন, কারণ প্রত্যেকটি পাতায় রয়েছে ফ্রেশ অক্সিজেন তৈরির কারখানা, বিনা প্রয়োজনে একটি গাছ কাটাও নিষেধ। আজ এসব মাসয়ালা বলে যদি মুসলমানসহ দুনিয়ার প্রত্যেক জাতিকে হুশিয়ার করতে পারতাম তবে মানুষের নাক দিয়ে এবং কল কারখানার কালো ধোঁয়া থেকে বের হওয়া কার্বনডাই অক্সাইড গ্যাস বায়ুমন্ডলিতে বৃদ্ধি পেত না এবং ঘটতোনা পরিবেশ দুষণীয় হওয়ার মতো কোনো ঘটনা। এ ধরনের লিখলে মাসের পর মাস লেখা যাবে কিন্তু আর লিখব না। এবার বলব শুধু চিন্তা করতে যে ইল্‌ম গোপন করার কারণে কি মানুষের দোযখের ইন্ধন হওয়ার ঘটনা ঘটে। শুধু তা নয়, জীবজন্তু পশু পাখী গাছপালা প্রত্যেকেই ক্ষতিগ্রস্ত হয়, এমন কি সমুদ্রের জীব জানোয়ারও এ ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পায় না। কাজেই ইল্‌ম গোপনকারীদের যারা লা'নত করে তাদেরকে আল্লাহ সংক্ষিপ্তভাবে এক কথায় বলেছেন لَعِنُوْنَ অর্থাৎ লা'নতকারী যার মধ্যে মানুষ সহ সমস্ত জীব-জানোয়ার পশু পার্খী, কীট পতঙ্গ গাছ পালা ইত্যাদি সবাই রয়েছে। তাই ইমাম হুসাইন (রা) কি এদের প্রত্যেকের অভিশাপ পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন? তা কিছুতেই পারেন না। পারেন না বলেই তো তিনি জীবন দিয়ে তার ইল্‌মকে প্রকাশ করে দিয়েছেন।

www.pathagar.com

এখন চিন্তা করুন যাদের মধ্যে আল্লাহর কুরআনের ও রাসূলের ﷺ হাদীসের ইল্‌ম আছে তাঁরা। সেই সাথে আমিও চিন্তা করছি যে, আমি ও আমরা কোন يَكْتُمُوْنَ (তারা গোপন করে) এর ভূমিকায় আছি? নাকি এর পরবর্তী আয়াতে যাদের কথা বলা হয়েছে যে,

اِلاَّ الَّذِيْنَ تَابُوْا وَاَصْلَحُوْا وَبَيَّنُوْا .....

অর্থাৎ কিন্তু যারা ইল্‌ম গোপন করার পথ থেকে ফিরে বা তাওবা করে এবং নিজের পূর্ববর্তী দোষত্রুটি সংশোধন করে যা তারা গোপন করছিল তা তারা প্রকাশ করা শুরু করে। আমরা কি সেই প্রকাশকরীদের ভূমিকায় ফিরে যাব? হাঁ তবে বর্তমান যুগে আমাদের সাহসের একটা কারণও আছে বটে। তা হচ্ছে এই যে, আমাকে যশোর এয়ারপোর্টে একদিন একজন মুসল্লি ভাই যার বয়স ৫০/৫৫ হবে তিনি দীনি কথা আলোচনা প্রসঙ্গে বলে ফেললেন "এখন এমন কিছু দোয়া আমাদের মুরব্বিগণ আবিষ্কার করেছেন যা পূর্বে হয় কোনো আলেম মৌলভী জানতেন না, অথবা জানলেও আমাদের কাছে বলতেন না, এমন দোয়াই এখন আমরা মুরব্বীদের নিকট থেকে শিখতে পারছি, এটা আমাদের জন্যে সৌভাগ্যের কথা যে, আমরা আলেম না হয়েও এসব দোয়া শিখতে পাচ্ছি। এ রকম ফযিলাতওয়ালা একটা দোয়া আমি তাকে পড়ে শুনাতে বললাম, তিনি অল্প কথার একটা দোয়া আমাকে শুনালেন যা আমি অনায়াসেই মুখস্ত করে নিলাম। তিনি বললেন, এ দোয়া মাগরিবের নামাযের পর ৭ বার পড়লে বিগত জীবনের ৪০ বছরের যাবতীয় ছগীরা কবিরা গোনাহ সব মাফ হয়ে যায়। তখন আমর দারুন আফসোস হলো একটি কথা চিন্তা করে এবং আমি আমার সে আফসোসের কথা আমার মুসল্লি ভাইকে বলেও ফেললাম যে, ইস কি সর্বনাশটা হয়েছে এ দোয়াটা এ যাবত গোপন থাকায়, বিশেষ করে খোদ নবী ﷺ পরিবারেরও যদি এ দোয়াটা জানা থাকতো তাহলে কি আর হযরত হুসাইন (রা) শহীদ হতেন? তাঁর বংশের বহু লোক এমনকি কোলের দুধের বাচ্চাটা আসগরের বুকে কি তীর বিদ্ধ হতো? তাঁরা যদি এ দোয়াটা জানতেন তাহলে সামাজিকভাবে ইয়াজিদকে আপাততঃ খলিফা বলে স্বীকার করে নিয়ে যেটুকু গোনাহ হতো তা মাফ করিয়ে নেয়ার জন্যে এ দোয়াটি ৭ বার কেন ৭ হাজার বারও তো পড়ে নিতে পারতেন কিন্তু আফসোস যে ঐ সংকটময় মুহূর্তে কুরআন হাদীসের এত কথা মনে পড়তে পারল, আর যদি সত্যিই এ দোয়াটা তাঁর [ইমাম হুসাইন (রা)]-এর জানা থাকতো তাহলে অবশ্যই এতবড় বিপদ মুহূর্তে তা মনে পড়তো এবং তাকে জীবনও দিতে হতো

www.pathagar.com

না। এতটুকু বলে আবার মুসল্লিকে জিজ্ঞেস করলাম, ভাই আমি এ দোয়াটার কথা আপনার মুখে শুনা মাত্রই ইমাম বংশের কারবালার মাঠের করুন অবস্থার কথা মনে পড়ে তো সত্যিই আফসোস হচ্ছে যে, যদি তাঁরা এ দোয়াটা জানতেন তাহলে কতই না ভাল হতো। ভাই আপনার মনে কি এ দোয়া জানার পর ইমাম বংশের ধ্বংসের কথা মনে পড়ে একটুও আফসোস হয়নি? সেখানে আরো লোক উপস্থিত ছিলেন, তাঁরাও আমার আফসোসের কথাগুলো শুনলেন, এরপর দেখলাম কিছু মানুষ আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। ..... তারপর তাঁরা অনেকেই অনেক ধরনের কথা বললেন কিন্তু এক ব্যক্তি বললেন "আপনি তো বেশ খানিক চিন্তায় ফেলে দিলেন" এ চিন্তা আমি শুধু তাদেরকেই ফেলতে চাইনি, এ চিন্তায় আমি ফেলতে চাই সবাইকে।

আমি দোয়াটা জানা সত্ত্বেও বললাম না আমার ঈর্শার কারণে। আমার ঈর্শাটা হলো এ জন্যে যে, যারা জীবনের সবটুকু তাজা রক্ত ঢেলে দিয়ে যাবে বেহেশতে আর আপনি এক ফোটা রক্ত না দিয়েই চলে যাবেন শুধু একটা দোয়া ৭ বার পড়ে এতো সহজ পথে বেহেশ্‌ত পাওয়া আমার মনে সয় না। এ জন্যেই এ সহজ পথে বেহেশতে যাওয়ার দোয়াটা আমি আপনাদের শিখালাম না। আমার যে ভাইয়ের সহজ পথে কোনো বিপদে পা না দিয়ে সহজ পথে বেহেশতে যাওয়ার আশা করে বসে আছেন তাদেরকে বলব। বলব এবং জিজ্ঞেস করব আপনারা কি ইমাম হুসাইন (রা)-এর চেয়েও বড় আলেম হয়ে গেছেন যে, তিনি যে পথে বেহেশতে যাওয়ার ভরসা করতে পারেননি, আপনারা সেই সহজ পথে বেহেশতে যাওয়ার ভরসা করে বসে আছেন? অবশ্য এসব কথা বলার আমার দরকার ছিল না, কিন্তু দরকার মনে করছি এ জন্যে যে, আল্লাহ আমাকে কিয়ামতে পাকড়াও না করেন যে, তুমি যা জানতে তা গোপন করলে কেন? তার যেন জবাব দিতে পারি সেই জন্যে বলছি– বেহেশতে যাওয়ার এ ধরনের কোনো সহজ পথ নেই। যারা সহজ পথের ভরসা করে বসে আছেন। তাঁরা কি সঠিক ধারণার উপর আছেন না কি ভুল ধারণার উপর আছেন তা একটু চিন্তা করে দেখার জন্যেই যশোর এয়ারপোর্টে এক মুসল্লির সাথে ঠিক যে যে কথাবার্তা হয়েছিল আমি সেটি আপনাদের নিকট তুলে ধরলাম। ভাবলাম এজন্যে বেহেশতে যাওয়ার সহজ পথটা ইমাম হুসাইন (রা) কেন ধরেননি তা চিন্তা করে দেখুন।

www.pathagar.com

বিষাদ সিন্ধুর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বাংলাদেশ বর্ষ পরিসংখ্যানের হিসাব মুতাবিক বাংলাদেশের গ্রামের সংখ্যা ৬৮,৩৮৫ আর বাড়ীর সংখ্যা ১,২৬,৭৪,০০০ এর কাছাকাছি। এ হলো এপার বাংলার বৃহত্তর ১৯টি জেলার গ্রাম ও বাড়ীর সংখ্যা আর ওপার বাংলায় রয়েছে আরো কয়েক জেলা যা বৃটিশ সরকার আমলে বিভক্ত ছিল না, সেগুলো হচ্ছে ১। ২৪ পরগনা, ২। কলকাতা (কলকাতাকেও একটা জেলা ধরা হয়) ৩। হাওড়া, ৪। হুগলি, ৫। মেদনীপুর, ৬। বীরভূম, ৭। বাঁকুড়া, ৮। বর্দ্ধমান, ৯। পাবনা, ১০। মুর্শিদাবাদ, ১১। পশ্চিম দিনাজপুর, ১২। শিলিগুড়ি, ১৩। দার্জিলিং, ১৪। জলপাইগুড়ি। এখন অমরা যদি একটা গড় করে উভয় বাংলার একটা কাছাকাছি গ্রামের সংখ্যা বের করি তাহলে ৬৪,৩৮৫টি করে গ্রাম গড়ে প্রত্যেক জেলায় আছে। ঠিক এভাবেই গড় হিসাবে ওপার বাংলার গ্রাম সংখ্যার গড় হিসাবটা দাঁড়ায় ৩৫৯৯কে ১৪ দিয়ে গুণ করলে যে সংখ্যা দাঁড়ায় ঐটা। আর সেটা হলো ৩৫৯৯ × ১৪ = ৫০৩৮৬টি গ্রাম ওপার বাংলায়। তাহলে অবিভক্ত বাংলা প্রদেশের গ্রামের সংখ্যা বৃটিশ আমলে ছিল ৬৮৩৮৫ + ৫০৩৮৬ = ১,১৮,৭৭১। এ সংখ্যাটাকে আমরা একটা কাছাকাছি সংখ্যায় ধরলে ধরতে পারি– উভয় বাংলায় বৃটিশ আমলে প্রায় ১ লক্ষ ১৯ হাজার গ্রাম ছিল। যতদূর মনে আছে তাতে এবং আমার সমবয়সিদেরও যারা বিভিন্ন জেলার লোক আছে তাদের নিকট থেকে যা শুনেছি তা আমার চোখে দেখা জিনিসের সাথে হুবহু মিল রয়েছে, তাহলো প্রতি বছর মুহররম মাসের ১০ তারিখের রাতে অর্থাৎ আশুরার রাতে প্রতি গ্রামের মাদবারের বাড়ীতে অর্থাৎ প্রতি গ্রামের অন্তত কম হলেও ৩/৪ বাড়ীতে সারারাত বিষাদ সিন্ধু পড়া হতো এবং গ্রামের বেশ কিছু লোক তা সারা রাতভর শুনতো। তারা মনে করতো মিলাদ মাহফিলে হাজির হলেই যে রকম বহুত বহুত সওয়াব পাওয়া যায়, ঠিক তদ্রুপ বিষাদ সিন্ধু রাত জেগে শুনলেও সেই সওয়াব মিলবে। আর মিলাদে যেমন মিষ্টি বিতরণ হয় তেমন বিষাদ সিন্ধুর শ্রোতাদের রীতিমত পেট পুরে ভাল উন্নতমানের খাবার দিতেন; প্রত্যেক মাদবার সাহেব যাদের বাড়ী বিষাদ সিন্ধু পড়া হতো। আমার বিশ্বাস যাদের বয়স আমার মত ৭০-এর কাছাকাছি তারা প্রত্যেকেই এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

www.pathagar.com

এখন চিন্তা করুন, সারা বাংলাদেশের (অবিভক্ত) গ্রাম সংখ্যা যেখানে ১ লক্ষ ১৯ হাজারের কাছাকাছি, সেখানে প্রত্যেক গ্রামে যদি ৩টে করে বিষাদ সিন্ধুও থেকে থাকে তাহলে মোট কত বিষাদ সিন্ধু ছাপতে হয়েছিল। অন্ততঃ পক্ষে ১,১৯,০০০ × ৩ = ৩,৫৭, ০০০ আর যদি দেশের বিশেষ বিশেষ শিক্ষিত বা ধনী মহাজনদের বাড়ীতে একটা করে বিষাদ সিন্ধু থেকে থাকে তাহলে ৪ লাখ বিষাদ সিন্ধু ছাপতে হয়েছিল আর তখনই বা কি আর এখনই বা কি, বিষাদ সিন্ধুর মত এতবড় একখানা বই ৪ লাখ ছাপা কি একটুখানি কথা? আমিতো নিজে লেখক ও প্রকাশক হয়ে জানি যে, ৮/৯ ফর্মার একখানা বই মাত্র ৫ হাজার ছাপতেই বাঁধাই খরচসহ প্রায় ৫০/৬০ হাজার টাকা কম পক্ষে খরচ পড়ে, তাও নিউজপ্রিন্টে ছাপলে, আর সাদা কাগজে ছাপলে লাখ টাকায়ও পারা মুস্কিল। সেখানে বিশ/ত্রিশ ফর্মার একখানা বই যদি হোয়াইট প্রিন্টে বা সাদা কাগজে বোর্ড বাঁধাই কভারে ছাপা হয় তাহলে কত টাকা দরকার? এটা কি কেউ হিসাব করে দেখেছেন এবং কোনো মুসলমান কি এর খোঁজ খবর নিয়ে দেখেছেন যে, এ মোটা অংকের টাকা কোথা থেকে এসেছিল? আমার পাঠ্য জীবনে কলকাতায় আমাদের মাদ্রাসার প্রবীণ হিন্দুস্তানী হুজুরদের নিকট থেকে এর যেটুকু তথ্য পেয়েছি তা হচ্ছে এই যে, বৃটিশ সরকার এ বইটা লিখতে মীর মোশাররফ হোসেনকে সার্বিক সহযোগিতা করেছে এবং পরিকল্পিতভাবেই কারবালার মূল ঘটনাকে কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে দেয়ার উদ্দেশ্যেই বইটা লেখান হয়েছিল এবং মোটা অংকের টাকা দিয়ে বইটা ছাপানোর এবং তা বাংলার মুসলমানদের প্রতি ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়ার ব্যাপারে বৃটিশ সরকারের লাভটা কি ছিল? এটা বলব ইনশাআল্লাহ্। বলার পূর্বে অন্ততঃ ৫০ বছর পূর্বের দৈনিক আজাদ খবরের কাগজে কলকাতায় থাকতে একটা ঘটনা পড়েছিলাম যে ঘটনাটা এখানে তুলে ধরব ইন্‌শাআল্লাহ। তারপর বলব– এতে বৃটিশ সরকারের কি লাভ ছিল। ঘটনা যে ভাষায় লেখা ছিল হুবহু সেই ভাষায় আমি আল কুরআনের সূরা মুখস্ত রাখার মত মুখস্ত রাখিনি তবে মূল বিষয়টা আমার নিজের ভাষায় লিখলেও মূল ঘটনা বা মূল বিষয়বস্তুর মধ্যে সামান্যতমও যোগ বিয়োগ করিনি, হুবহু পুরা ঘটনা সঠিকভাবেই ইনশাআল্লাহ পরিবেশন করব। ঘটনাটা নিম্নরূপ। এ ঘটনার মধ্যে পাবেন ইংরেজদের মাথা ব্যথার কারণ।

www.pathagar.com

ইমাম হুসাইন (রা)-কে নিয়ে ইংরেজদের কেন মাথা ব্যথা

ইংরেজদের যে ইমাম হুসাইন (রা)-এর ব্যাপারে বিরাট মাথা ব্যথা ছিল তার অনেক প্রমাণ রয়েছে। বিশেষ করে যে কারণে হযরত ইমাম হুসাইন (রা) জীবনদান করেছিলেন এবং এর পিছনে যে ইসলামী চেতনা ছিল তা যদি এ দেশের মুসলমানদের মাথায় একবার ঢুকে যায় তাহলে তাদের গদির ভিত নড়বড়ে হয়ে যাবে এবং ভবিষ্যতে তাদেরকে এদেশ ছাড়তে হবে এ ভয় তাদের ছিল। এ কারণেই বিষাদ সিন্ধুর মাধ্যমে চেয়েছিল মুসলমানদের ইসলামী জিহাদী চেতনাকে কালো পর্দা দিয়ে ঢেকে দিতে। কিন্তু আগুন যেমন খড় কুটো দিয়ে ঢেকে রাখা যায় না তেমন তারাও কারবালার মূল চেতনাকে ঢেকে রাখতে পারেনি।

সে প্রায় ৫০ বছর আগের কথা হবে। একদিন দৈনিক আজাদে একটা ঘটনার কথা পড়লাম যা কলকাতায় ঘটেছিল।

একদিন খৃস্টান ধর্মযাজকগণ এক ধর্মীয় সভা ডেকে বহু মুসলমান একত্রিত করে ওয়াজ করে বুঝাচ্ছিল যে, যীশু খৃস্টই সর্বশেষ নবী এবং খৃস্ট ধর্মই একমাত্র সঠিক ধর্ম। যে দিন এ মাহফিল হচ্ছিল সে দিনই ঘটনাক্রমে দিল্লী থেকে মরহুম মাওলানা শাহ আবদুল আজীজ দেহলুবী (র) কলকাতা আসেন এবং এসেই শোনেন যে খৃস্টানরা মুসলমানদের মধ্যে ওয়াজ করছে। শুনে তৎক্ষণাৎ সেখানে গিয়ে হাজির হন।

মাওলানা সাহেবকে যারা চিনত তারা সবাই উঠে দাঁড়াল, সালাম করল।

খৃস্টান ধর্মযাজকরা পরিচয় পেয়ে তাঁকে নিয়ে মঞ্চে বসাল। তারা ভাবল মাওলানা সাহেবকে এমন প্রশ্ন করব যে প্রশ্নের দ্বারাই প্রমাণ করে দেব যে, ইসলাম সত্য ধর্ম নয় এবং মুহাম্মদ ﷺ ও প্রকৃত রাসূল নন (নাউযুবিল্লাহ)।

তারা প্রশ্ন করল ঃ

পাদ্রি ঃ আচ্ছা, মাওলানা সাহেব আপনারা বলেন হযরত মোহাম্মদ ﷺ নাকি আল্লাহর খুব পেয়ারা দোস্ত ছিলেন এটা কি ঠিক?

www.pathagar.com

মাওলানা ঃ হাঁ, অবশ্যই ঠিক।

পাদ্রি ঃ তিনি তার নাতি ছেলে ইমাম হুসাইন (রা)-কে নাকি খুবই ভালোবাসতেন, এটা কি ঠিক?

মাওলানা ঃ হাঁ, এতে কোনোই সন্দেহ নেই।

পাদ্রি ঃ আচ্ছা মাওলানা সাহেব আপনারা বলেন বেহেশতের মধ্যে কেউ আল্লাহর কাছে কিছু চাইলে তা সাথে সাথে মঞ্জুর হয়ে যায়, এটা কি ঠিক?

মাওলানা ঃ হাঁ, এটাও ঠিক।

পাদ্রি ঃ আচ্ছা ইমাম হুসাইন (রা) যখন শত্রুর সম্মুখীন হলেন, তাকে যখন শত্রুরা হত্যা করতে উদ্যত হল তখন রাসূল কোথায় ছিলেন?

মাওলানা ঃ বেহেশতে ছিলেন।

পাদ্রি ঃ তিনি জানতে পারেন নাই যে তার প্রিয় নাতিকে শত্রুরা মারতে যাচ্ছে?

মাওলানা ঃ হাঁ, জানতে পেরেছিলেন।

পাদ্রি ঃ আচ্ছা যদি বেহেশতে বসে আল্লাহর কাছে বলতেন যে, আল্লাহ আপনি আমার দোস্ত আর আমিও আপনার দোস্ত এবং শেষ রাসূল। আপনি আমার নাতিকে শত্রুর হাত থেকে উদ্ধার করে দিন। তাহলে তো তার নাতিকে কেউ মারতে পারতো না। তা কি তিনি মুনাজাত করে বলেছিলেন।

মাওলানা ঃ হাঁ, তা বলেছিলেন।

পাদ্রি ঃ তা যদি বলে থাকেন তাহলে সে দোয়া কবুল হলো না কেন? একে তো রাসূলের দোয়া, তাও একেবারে বেহেশতে বসে।

মাওলানা ঃ রাসূলের দোয়া কবুল করতে না পেরে আল্লাহ হাউ মাউ করে কেঁদে ফেললেন।

পাদ্রি ঃ কি বলেন মাওলানা সাহেব, আল্লাহ পারেন না, এ কেমন কথা বললেন? আর আল্লাহ কি কাঁদেন?

মাওলানা ঃ হাঁ, আল্লাহ বললেন, দেখুন আপনি আমার বন্ধু আর হুসাইন হলো আপনার নাতি। আর ঈসা যে আমার নিজের ছেলে। তাকে যখন শত্রুরা মারল তখনও তো আমি তাকে উদ্ধার করতে পারিনি। আর আপনার নাতিকে আমি কি করে উদ্ধার করব?

পাদ্রি ঃ ওহ, আপনি তো বড় সাংঘাতিক বিপজ্জনক ব্যক্তি দেখছি।

এ ঘটনা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় ইংরেজরা কি চেয়েছিল।

www.pathagar.com

ইংরেজ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল ইসলামকে মিথ্যা ধর্ম হিসাবে প্রমাণ করা এবং ইসলামের মহান ব্যক্তিদেরকে চরিত্রহীন হিসাবে সমাজের সামনে তুলে ধরা। ইংরেজ সরকার যখন দেখল মীর মোশাররফ হোসেনের দ্বারা তাদের একটা উদ্দেশ্য সিদ্ধি হচ্ছে তখন তারা একটা ব্যবস্থা করল যা হয়ত আমরা খুব কম লোকেই ভেবে দেখে থাকি। তা হচ্ছে এই যে, তৎকালিন বাংলাদেশের প্রায় এক লাখ ১৯ হাজার গ্রামের প্রতি গ্রামে যেন ৩/৪ খানা বিষাদ সিন্ধু পৌঁছে যায় এবং এ বইটাকে যেন মুসলমানরা একটা ধর্মীয় গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করে। এজন্যে যত প্রকার সাহায্য সহযোগিতা দরকার ছিল তা তৎকালিন সরকার বহন করেছেন। প্রতি গ্রামে কমপক্ষে ৩/৪ খানা করে বই পৌঁছালেও প্রায় ৪ লাখ বইয়ের দরকার হয়েছিল। এটা যে একজন লেখকের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ছাপা সম্ভব ছিল না তা বুঝতে কারও পক্ষেই কষ্ট হওয়ার কথা নয়।

কারবালার ঘটনার সংক্ষিপ্ত মূল ইতিহাস

এপার বাংলা ও ওপার বাংলায় মানুষ (আমি মুসলমান না বলে এজন্যে মানুষ বললাম যে, হিন্দু মুসলমান সবাই এর মধ্যে শামিল আছে।) কারবালার ঘটনা সম্পর্কে যাই জানে তা জানে বিষাদ সিন্ধু থেকে। ইসলামের ইতিহাস বা তারিখে ইসলাম যা মাদ্রাসার পাঠ্য তার থেকে নয়। আর গ্রামের সাধারণ মানুষের মনের অবস্থা কেমন তা একটা ছোট্ট কাহিনী থেকে বুঝতে পারা যাবে। আমি একদিন ঝিকরগাছার পাশের গ্রাম পুরন্দরপুরে মুহাররামের আলোচনা করতে গিয়ে বললাম বিষাদ সিন্ধু কোনো ইতিহাস নয়, এটা একটা উপন্যাস মাত্র, এর মধ্যে সত্য মিথ্যার সংমিশ্রণ রয়েছে, বললাম এর অনেক কথাই মিথ্যা এবং কাল্পনিক। তখন ঐ মাহফিলের একজন প্রবীণ মাদবার যিনি গ্রামে মাদবারী করেন এবং ভাল বৈষয়িক জ্ঞান রাখেন, গ্রামের লোক যার কথার উপরে কেউ কথা বলতে সাহস করে না, এমন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়িয়ে আমার কথার প্রতিবাদ করে বললেন, "যা বইতে লেখা আছে তা কি মিথ্যা হতে পারে, আর যা মিথ্যা তা কি কেউ বইতে লিখতে পারে?" সে প্রায় ১২/১৩ বছর আগের কথা। আমি সেই দিনই প্রথম চিন্তা করলাম যে, কোনো কথা কোনো বইতে কেউ যদি ছাপার অক্ষরে লেখা দেখে তবে তা কুরআনের কথার মতোই সঠিক, সত্য ও নির্ভুল মনে করে। সে দিনই প্রথম বুঝলাম গ্রামের সাধারণ মানুষ ছাপার অক্ষরে লেখার কত মূল্য দিয়ে থাকে, এর পূর্বে সত্যিই

www.pathagar.com

আমার এরূপ ধারণা ছিল না। এরপর আমি কৌতুহলি মন নিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় যখন ওয়াজ নসিহতের কাজে বা ইসলাম প্রচারের কাজে গিয়েছি তখন মানুষ কারবালার ঘটনা সম্পর্কে কি ধারণা রাখে তা বিভিন্নভাবে যাচাই বা পরীক্ষা করে দেখেছি যে, একমাত্র বিশেষ বিশেষ কিছু আলেম, আর ইউনিভারসিটির ইসলামী ইতিহাসের ছাত্র-শিক্ষক ছাড়া সবাই বিষাদ সিন্ধুর ঘটনাকেই কারবালার প্রকৃত ঘটনা বলে বিশ্বাস করে। কাজেই কারবালার মূল ঘটনাকে নতুন করে মানুষের সামনে তুলে ধরার জন্যে দরকার আর ৪/৫ লাখ বই ছেপে তা সারাদেশে এবং ওপার বাংলায়ও ছড়ান। কিন্তু যে উদ্যোগ নিয়েছিল বৃটিশ সরকার সে উদ্যোগ কি নেবে কোনো মুসলিম সরকার? এ উদ্যোগ এমনকি সৌদি সরকারও নেবে না, কারণ কারবালার প্রকৃতি ঘটনা মুসলমানদের মগজে ঢুকে গেলে ভরাডুবি হওয়ার ভয় আছে একমাত্র (আমার জানা মতে) পাকিস্তান আর ইরান ছাড়া পৃথিবীর সব রাষ্ট্রেরই রাষ্ট্র প্রধানদের। কাজেই এর উদ্যোগ নিতে হবে বেসরকারীভাবে আমাদের বেসরকারী লোকেদেরকেই। তাই আমি মূল ঘটনাকে খুবই সংক্ষিপ্তকারে তুলে ধরতে চাই মাত্র দুটি কারণে। যথা (১) বিষাদ সিন্ধু থেকে পাওয়া ভুল ধারণা যুক্তির মাধমে খণ্ডন করা এবং (২) প্রকৃত ঘটনা কি ছিল তা সাধারণভাবে সবাইকে এবং বিশেষভাবে মুসলমানদের মনে মগজে ঢুকিয়ে দেয়া। তবে আমি এ আশংকা থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারছি না যেসব মুসলমান আমার যুক্তি মানবে। পারছি না এজন্যে যে, এই মাত্র গতকাল ১৯/৭/৯১ তারিখে নারায়ণগঞ্জের এক মসজিদে জুমার নামাযের পূর্বে এ বিষয়ে আলোচনা করে দেখলাম এখন এ বিজ্ঞান দর্শন ও প্রযুক্তি বিদ্যার চরম উন্নতির যুগেও এমনও লোক রয়েছেন যারা বিষাদ সিন্ধুর কোনো কথার যে মিথ্যা হতে পারে তা এখনও অনেকে বিশ্বাস করতে নারাজ। আমার গত কালকের আলোচনারও প্রতিবাদ হয়েছে। তবে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি যে, গতকাল একই দিনে আসর বাদ থেকে এক জায়গায় এবং মাগরিব বাদ থেকে আরেক জায়গায় দুটি সুধী সমাবেশে যখন আলোচনা করেছি তখন শ্রোতাগণ আমার আলোচনাকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং ঢাকা হাইকোর্টের একজন এ্যাড্‌ভোকেট এবং একজন ইঞ্জিনিয়ার সহ অনেক গণ্যমান্য লোক একথা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করেছেন যে, বিষাদ সিন্ধু মুসলমানদের দারুণভাবে বিভ্রান্ত করেছে এবং কারবালার মৌলিক শিক্ষাকে ধামাচাপা দেয়াই ছিল বিষাদ সিন্ধু লেখার মূল উদ্দেশ্য। এতে গতকালই তিন সময় তিন জায়গায় এ একই

www.pathagar.com

বিষয়ের উপর আলোচনা করে স্পষ্ট বুঝলাম কিছু উচ্চ শিক্ষিত লোক যারা যুক্তি বুঝেন এবং যুক্তি মানতে রাজী তাদের জন্যে আমার এ লেখা অবশ্যই কাজে লাগবে এবং এমনও কিছু লোক রয়েছেন তারা হয়ত কারবালার মূল শিক্ষাকে গোড়ামীর বশবর্তী হয়ে নাও মানতে পারেন যেমন গতকাল নারায়ণগঞ্জের এক মসজিদের আলোচনা থেকে আমি আঁচ করতে পেরেছি। তবে এ ব্যাপারে আমার মনে কোনো সন্দেহ নেই যে, কিছু লোক বিশেষ করে যারা ইসলাম সম্পর্কে কিছু পূর্ব জ্ঞান রাখেন তারা অবশ্যই উপকৃত হবেন। তা ছাড়াও আমাদের উপর অর্থাৎ উম্মতে মুহাম্মদীর উপর একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে ইসলামের যে কোনো দিক সম্পর্কে মুসলামানদের মধ্যে কোনো ভুল ধারণা থাকলে তা শুধরে দেয়া। এ দায়িত্ব পালনের জন্যেই এ বিষয়ে লিখতে কলম ধরেছি। আমার আল্লাহই ভাল জানেন এতে বাংলা ভাষাভাষি মুসলিম সমাজ কতটুকু উপকৃত হবেন; তবে আমি যেটা আমার দীনি দায়িত্ব মনে করি তা আমাকে পালন করতে হবেই। তাতে কাজ কতদূর হবে না হবে সেটা আমার দেখার ব্যাপার নয়। তা আমার আল্লাহ্ই ভাল জানেন।

বিষাদ সিন্ধু ইমাম হুসাইন (রা) সম্পর্কে যে ধারণা দিয়েছে

বিষাদ সিন্ধুতে দেখান হয়েছে কারবালার ঘটনাটা ঘটেছিল জয়নাব নামক একটা মেয়ে বিবাহকে কেন্দ্র করে। এতে দেখান হয়েছে কোনো একজন ঘটক একটা ছেলের সাথে জয়নাবের বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে জয়নাবের নিকট যাচ্ছিল, পথিমধ্যে হযরত হুসাইন (রা) ঐ ঘটককে বলেছিলেন যে, জয়নাবের কাছে আমার প্রস্তাবটাও দিও। আমিও তাকে নিকাহ করতে আগ্রহী। এখন আসুন যুক্তির কষ্টি পাথরে যাচাই করে দেখি এ কথাটুকু প্রকৃত সত্য হতে পারে কিনা। দেখুন, আমাদের সমাজে লম্পট ও দুশ্চরিত্রের লোকের কোনো অভাব নেই। তবুও কোনো লম্পট মার্কা এমন দুশ্চরিত্রের লোক কি আছে যে কেউ কারো ছেলের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোনো মেয়েওয়ালার বাড়ী যাওয়ার সময় পথে ঘটককে ধরে বলে দেয় যে, মেয়েটার কাছে আমার প্রস্তাবটাও দিও। এরূপ বদ চরিত্রের লোক আমাদের এ সমাজেও নেই বলেই আমি জানি এবং এরূপ চরিত্রের কোনো বদ লোক আমাদের এ ঘুনে ধরা সমাজেও যে আছে তা আজও

www.pathagar.com

পর্যন্ত আমি শুনিনি। শুধুমাত্র ঘটককে পথে ধরে বলে দেয়া যে, "জয়নাবের কাছে আমার নামের প্রস্তাবটাও দিও" এর দ্বারা ইমাম হুসাইনের চরিত্রের উপর কি পরিমাণ চুনকালি লেপনের অপচেষ্টা করা হয়েছে তা কি আমরা কখনও সুস্থ মাথায় চিন্তা করে দেখেছি। এবার আমার একটা যুক্তি থেকে চিন্তা করুন ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা আল্লাহর কাছে এবং রাসূলের ﷺ-এর কাছে কতটুকু ছিল এবং সেই ধরনের মর্যাদা সম্পন্ন কোনো ব্যক্তির দ্বারা অন্যের বিয়ের ঘটককে পথে ধরে এ ধরনের প্রস্তাব দেয়া যুক্তির ধোপে টেকে কি?

ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা

এ মর্যাদা বুঝানোর জন্য আমাকে একটি ঐতিহাসিক কাহিনী শুনাতে হবে। নইলে ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা বুঝান আমার পক্ষে সহজ হবে না, তাই বলছি একটা সত্য ঘটনা।

একদিন জলীয় বাষ্পমুক্ত নিল আকাশে রাতের বেলা যখন ছোট বড় অসংখ্য তারকা মিটমিট করে জ্বলছিল তখন হযরত ওমর (রা)-এর মেয়ে রসূল ﷺ স্ত্রী হযরত হাফসা (রা) আকাশের দিকে চেয়ে স্বামী রসূল ﷺ -কে জিজ্ঞেস করলেন, আকাশের তারকা এতবেশী যে তা গুনে হিসাব করা যায় না, আচ্ছা দুনিয়ার এমন কি কোনো লোক আছে যার আমলনামায় আকাশের তারকার সংখ্যার চেয়েও বেশী সওয়াব লেখা হয়েছে? জবাবে হুজুর ﷺ বললেন, হাঁ, এমন লোক অবশ্যই আছে। পরে হযরত হাফসা (রা) জিজ্ঞেস করলেন, এমন কোনো ব্যক্তির নাম আমাকে বলবেন কি? জবাবে রসূল ﷺ বললেন, তোমার আব্বা হযরত ওমর (রা) তো এমন ব্যক্তি যার সওয়াবের সংখ্যা আকাশের তারকার চেয়েও বেশী। কথাটা শুনলেন হযরত আশেয়া সিদ্দিকা (রা)ও। তিনি লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর আব্বা আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর নাম রসূল ﷺ বললেন না। কিন্তু পরের দিন যখন হযরত ওমর (রা) রসূলের বাড়ীতে এলেন তখন মেয়ে খুশী মনে গিয়ে আব্বাকে খবর শুনালেন যে, গত রাতে রসূল ﷺ বলেছেন যে, আকাশের তারকার সংখ্যার চেয়েও বেশী সংখ্যক সওয়াব আপনার আমলনামায় লেখা হয়েছে। শুনে হযরত ওমর (রা) মেয়েকে বললেন যে, মা, তুমি তো জান না যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর আমলনামায় কত সওয়াব জমা হয়েছে। তিনি (হযরত ওমর (রা) বললেন, আমি একদিন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর

www.pathagar.com

কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম যে, আপনার এক রাতের সওয়াব (যে রাতে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রসূল ﷺ-এর হিজরাত করার সময় সঙ্গী হয়েছিলেন) দিয়ে আমার সারা জীবনের সওয়াব আপনি বদলে নিন, কিন্তু এ প্রস্তাবে তিনি রাজী হননি, তাহলে বুঝ যে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর আমলনামায় কত সওয়াব লেখা হয়েছে। আর সে এক রাতের সওয়াব কি আসলেই এক রাতের সওয়াব ছিল? না, তা প্রকৃতপক্ষে বহু রাতের প্রস্তুতি নেয়ার পর এক রাতের সওয়াব। অর্থাৎ যেদিন হযরত জিবরাঈল (আ) এসে রসূল ﷺ-কে বললেন যে আপনার নিজের লোক বা আপনার এলাকার লোক আপনাকে সহ্য করতে পারবে না, তারা যে রাতের আপনাকে হত্যার চেষ্টা করবে। সে দিন আমি জিবরাঈল (আ)-কে দিয়ে খবর দেব। খবর পাওয়ার সাথে সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবেন হিজরাত করে চলে যাবেন মদীনায়। তার জন্যে এখন থেকে প্রস্তুতি নিতে থাকুন। এরপর হুজুর ﷺ হযরত আবু বকর (রা) যেহেতু তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন বললেন যে এ মাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে খবর এসে গেল যে, আমাকে হিজরত করতে হবে। এবং যখনই হুকুম হবে তখনই বেরিয়ে পড়তে হবে। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বলে রাখলেনঃ রসূল ﷺ-কে যে, হুজুর আপনি একা না গিয়ে আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন। রসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন তখন আমি তোমাকে পাব কোথায় যদি তখন তুমি আমার কাছে না থাক। তখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বললেন– আমি আপনার কাছে না থাকলে অবশ্যই আমার বাড়ী থাকব। আপনি যাওয়ার সময় আমার প্রাচীরের দরোজায় হাত দিয়ে একটু ছোট্ট আঘাত করলে যেটুকু আওয়াজ হবে তাতেই আমি যদি টের পেয়ে বেরিয়ে আসতে পারি তবে আপনার সঙ্গি হব ইন্‌শাআল্লাহ। এরপর কেটে গেলে কয়েক মাস। হঠাৎ একদিন রাতে জিবরাঈল (আ) এসে রসূলকে ﷺ বললেন, আপনি এখনই হিজরত করুন, আল্লাহর নির্দেশ। তখন রসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর নিকট গচ্ছিত আমানতের মালগুলো হযরত আলী (রা)-কে বুঝিয়ে রসূলের ﷺ নিজের বিছানায় নিজের চাদর মুড়ি দিয়ে তাকে শুয়ে থাকতে বললেন এবং হিজরাতের নিয়তে ঘর থেকে বেরিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর বাড়ীর সদর দরোজা হাত দিয়ে একটু ছোট্ট আঘাত করলেন, দেখলেন সুইজ টিপলে আলো জ্বলে উঠতে যেমন দেরী হয় না, তেমন দরোজায় আঘাতের সাথে সাথে দরোজা খুলে গেল। দেখলেন, সফরের সামান ও একখানা লাঠি হাতে করে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) বেরিয়ে এসে সালাম দিয়েই বললেন হুজুর

www.pathagar.com

চলুন, রসূলুল্লাহ ﷺ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে তো জিবরাঈল (আ) বলে গেলেন, তোমাকে কে বললেন যে, তুমি প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনি জবাবে বললেন, যেদিন শুনেছি আপনাকে একদিন হিজরত করতেই হবে আমি সেদিনই বিশ্বাস করেছি যে, নিশ্চয়ই সামনে এমন একটা রাত আসবে যে রাতে আপনি দরোজায় আঘাত করবেন। তাই এ রাতটার জন্যে অপেক্ষায় আছি সেদিন থেকেই। আমি দিনে ঘুমিয়ে নেই এবং প্রত্যহ রাতে সারারাত এভাবে প্রস্তুতি নিয়ে আপনার ডাকের অপেক্ষায় থাকি। অপেক্ষায় থাকতে থাকতে আজ সেই রাতটা পেয়ে গেছি। ..... তিনি পাহাড়ের গুহায় রসূলের মাথা নিজের উরুর উপর রেখে রসূল ﷺ -কে ঘুমাতে দিয়েছেন, আর সেই মুহূর্তে হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-কে সাপে কামড়িয়েছে, বিষে সমস্ত শরীরে জ্বালা পোড়া শুরু হয়ে গেছে তবুও রসূলকে ﷺ জাগাননি। এরপর যখন হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর চোখের পানি হুজুরের কপালে পড়েছে তখন তিনি জেগে উঠে ব্যাপারটা শুনে তখন নিজের মুখের থু থু সেখানে (কামড়ান স্থানে) লাগিয়ে দিলেন এবং আল্লাহর কালাম পড়ে' ফুঁক দিলেন আর সাথে সাথে বিষের আছর নষ্ট হয়ে গেল।

এহেন ব্যক্তির চেয়েও ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা বেশী ছিল। কারণ স্বরূপ বলব, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর উপর দিয়েও এমন দিন গিয়েছিল যেদিন তিনি ইসলামের উপর ছিলেন না, যদিও সেই জীবনের সব গুনাহ আল্লাহ্ মাফ করে দিয়েছেন এবং তিনি জীবদ্দশায় বেহেশতী হওয়ার সুসংবাদ পেয়েছেন। কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা)-এর জীবনে এমন একটা মুহূর্তও যায়নি যখন তিনি ইসলামের উপর ছিলেন না। এরপরও একদিন নাতি নানার খোশ আলাপের সময় হুসাইন (রা) নানাকে জিজ্ঞেস করলেন, নানা, আপনার মর্যাদা বেশী না আমার মর্যাদা বেশী, নানা, রসূল ﷺ বললেন, আল্লাহ আমাকেই বেশী মর্যাদা দিয়েছেন। নাতি বললেন, (আমি পূর্বেই বলে নিয়েছি এসব কথাবার্তা খোশ আলাপ প্রসঙ্গে নাতি নানার আলাপ) আমি প্রমাণ করে দিতে পারি যে, আপনার চেয়ে আমার মর্যাদা বেশী। রাসূল ﷺ হাসতে হাসতে বললেন, আচ্ছা তুমি প্রমাণ কর আমি যুক্তিগ্রাহ্য হলে তোমার কথা মেনে নেব। তখন হুসাইন (রা) নানাকে জিজ্ঞেস করলেন, নানা আচ্ছা বলুন তো আপনার মার মর্যাদা বেশী না আমার মার মর্যাদা বেশী, রসূল ﷺ বললেন তোমার মার মর্যাদা বেশী। নাতি জিজ্ঞেস করছেন, আচ্ছা নানা বলুন তো আপনার আব্বার মর্যাদা বেশী না আমার আব্বার মর্যাদা বেশী, রসূল ﷺ বললেন, তোমার আব্বার মর্যাদা বেশী। পরে নাতি ইমাম হুসাইন (রা)

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলেন আচ্ছা নানা বলুন তো আপনার নানার মর্যাদা বেশী না আমার নানার মর্যাদা বেশী। তখন রসূল ﷺ বললেন, তোমার নানার মর্যাদা বেশী, তখন নাতি বললেন তাহলে দেখুন তো আমি কত দিক থেকে আপনার উপরে ..... আসলে কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) একথা নানাকে দিয়েই স্বীকার করিয়ে নিয়েছেন যে, আমার নানার মর্যাদা বেশী। এটা যদিও খোশ আলাপের ব্যাপার তবুও এর মধ্যে একটা সত্য নিহিত রয়েছে যে, জন্মগত ও রক্তগতভাবে জেনেটিক কারণে ইমাম হুসাইন (রা)-এর ঈমানী মজবুতির মর্যাদা সত্যিই অন্যান্য সাহাবীদের তুলনায় বেশী ছিল। এরপরও একটা যুক্তি দিচ্ছি তা হচ্ছে মুসলিম সমাজে 'পাক পাঞ্জাতন' নামে একটা কথা চালু আছে তা যেভাবেই এবং যে কারণেই হোক না কেন, পাক পাঞ্জাতন নামে একটা কথা সমাজে চালু আছে। এ পবিত্র ৫ ব্যক্তির মধ্যে রসূলও ﷺ আছেন এবং হযরত ফাতেমা (রা), হযরত আলী (রা), হযরত হাসান (রা) এবং হযরত হুসাইন (রা)ও আছেন, কিন্তু এ ৫জনের মধ্যে না হযরত আবু বকর সিদ্দিক শামিল ছিলেন আর না হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) শামিল ছিলেন। অবশ্য আমি একথা বলতে চাই না যে, হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা) এবং হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)-এর মর্যাদা কমছিল। তবুও ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা তাঁদের চেয়েও বিভিন্ন কারণে বেশী ছিল।

আর সেই ইমামের চরিত্রে কি জানায় যে তিনি অপরের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছে এমন ব্যক্তিকে বলতে পারেন যে, আমার নামটাও বল? বাঘের মধ্যে যেমন বকরীর স্বভাব সৃষ্টি হতে পারে না এবং বকরীর মধ্যে যেমন বাঘের স্বভাব সৃষ্টি হতে পারে না। এটা যেমন দিনের আলোর মত সত্য ঠিক তেমনিই ইমাম হুসাইন (রা)-এর মধ্যেও এমন চরিত্র সৃষ্টি হতে পারে না যে, তিনি অপরের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে যাচ্ছেন তখন ঘটককে বলতে পারেন আমার প্রস্তাবটাও দিও। তাহলে প্রশ্ন, কারবালার এ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল কোন্ কারণে? সেই কারণটাই এবার বলব ইনশাআল্লাহ্। এতক্ষণ যা বলেছি তা শুধু এতটুকু কথা প্রমাণ করার জন্যে যে, কারবালার ঘটনা কোনো বিবাহ কে কেন্দ্র করে ছিল না, এ ঘটনা ছিল অন্য কিছুকে কেন্দ্র করে যার সম্পর্কে রয়েছে ইসলামের মৌলিক আকীদার সাথে।

কারবালার ঘটনার আসল কারণ

হযরত আমীর মুআবিয়া (রা) রসূল ﷺ -এর সম্মানিত সাহাবী ছিলেন, তাঁর ছেলের নাম ছিল ইয়াজিদ। যা সবার জানা, হযরত মুআবিয়া (রা)-এর ইন্তেকালের পূর্বে একটি ঘটনা বাদে আমি আর কোনো ঘটনাই বলব না, অর্থাৎ

www.pathagar.com

আমি এটাও বলতে চাইন না যে, তিনি ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতের খবর শুনে ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন বলেছিলেন না আল্‌হামদুল্লিলাহ বলেছিলেন। আমি এটাও বলতে চাই না যে, কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তিনি তার পরবর্তী খলিফা হিসাবে ইয়াজিদের নামের প্রস্তাব করেছিলেন। কারণ তিনি একজন মহাসম্মানিত সাহাবী, তাঁর কি নিয়ত ছিল, কি দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তা তিনি জানেন এবং আল্লাহ জানেন; আমি এতটুকুই বলতে চাই, তাঁর ইন্তেকালের পরে তাঁর ওসিয়ত অনুযায়ীই হোক আর যে কারণেই হোক, ইয়াজিদ স্বঘোষিত খলিফা হয়েছিলেন এবং তার খেলাফতির স্বীকৃতি চেয়েছিলেন। তখন যে কয়জন তাঁর (এজিদের) খেলাফতির স্বীকৃতি দেননি তাঁর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন হযরত ইমাম হুসাইন (রা)। তিনি খেলাফতের পরিবর্তে রাজতন্ত্র কায়েম হোক তা তিনি চাননি এবং ইসলামে যে রাজতন্ত্র সমর্থনযোগ্য তার কোনো দলীল কুরআন হাদীসে এবং খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলের কোনো কার্যকলাপের মধ্যে এর (রাজতন্ত্রের) কোনো নমুনা পাননি। তাছাড়াও তিনি অত্যন্ত দূরদর্শী ছিলেন যার কারণে তিনি পূর্বেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, রাজতন্ত্র কায়েম হলে তার পরিণতি কি হতে পারে। গাড়ীর স্টেয়ারিং কেটে গেলে প্রথমে টের পায় ড্রাইভার, পরে টের পায় সচেতন যাত্রী, আর অবোধরা টের পায় গাড়ী যখন খাদে পড়ে হাত পা ভাঙ্গে তখন। ঠিক তেমনই হযরত হুসাইন (রা) ছিলেন সমাজরূপ গাড়ীর ড্রাইভার পর্যায়ের ব্যক্তি। তাই তিনি যখন দেখেছিলেন সমাজরূপ গাড়ীর খেলাফত আমলের স্টেয়ারীং কেটে গেছে এখন ইসলামী গাড়ী এমন খাদে পড়তে যাচ্ছে যে, এ গাড়ীর যাত্রী অর্থাৎ এ সমাজের মুসলমান এমন এক খাদে পড়তে যাচ্ছে যাতে মুসলমান আর কোনো দিনও আল্লাহর পথে চলতে পারবে না, তাই তিনি ইয়াজিদের খেলাফতির স্বীকৃতি দেননি। এতে কিছু মুসলমান ইমাম হুসাইন (রা)-কে বাগী বা (বিদ্রোহী) পর্যন্ত বলেছেন। ইমাম হুসাইন (রা) যখন ইয়াজিদের খেলাফতির স্বীকৃতি দিলেন না, তখন সাধারণ মুসলমান দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। একটা গ্রুপ যারা কোনো না কোনো রাজকার্যের সাথে জড়িত ছিলেন তারা প্রায় সকলেই চাকুরী রক্ষার জন্যে ইয়াজিদকে খলিফা বলে মেনে নেয়। আর অনেকে ইমাম হুসাইন (রা)-এর দিকে চেয়ে রইলেন যে, দেখি তিনি কি করেন। এতে সেই মুহূর্তে আরবে আমাদের বাংলাদেশের '৭১-এর ঘটনার মতে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ফলে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। অনেক লোক গৃহযুদ্ধে মরতে থাকে। তখন বেশ কিছু জ্ঞানী-গুণী মর্যাদাসম্পন্ন প্রবীণ মুসলমানও হযরত হুসাইন (রা)-একে

www.pathagar.com

বলতে থাকেন যে, আপনি ইয়াজিদকে খলিফা বলে মেনে নিলেই গৃহ যুদ্ধটা বন্ধ হয়ে যায়। অতএব গৃহযুদ্ধটা বন্ধ করার এবং অযথা বহু মুসলমানের প্রাণ নষ্ট হওয়ার হাত থেকে মুসলিম সমাজকে বাঁচার লক্ষ্যে আপনি ইয়াজিদের খিলাফতির স্বীকৃতি দিন, এতে ইমাম হুসাইন (রা) বুঝলেন আমি কেন যে ইয়াজিদের খিলাফতির স্বীকৃতি দিচ্ছি না তা এসব প্রবীণ মুসলমানগণও বুঝতে পারছেন না। তাই তিনি অত্যন্ত শান্ত মেজাজে সবাইকে বুঝালেন যে, কেন তিনি রাজতন্ত্রের স্বীকৃতি দিতে পারছেন না। তিনি বুঝালেন আমার সামনে যেসব বিপদ দেখতে পাচ্ছি তা আমি বলি আপনারা শুনুন এবং বুঝুন। তিনি বললেন যদি রাজতন্ত্র মেনে নেই তাহলে নিম্নের কাজগুলো অবশ্যই ঘটবে। যথা ঃ

১নং এরপর আর কেয়ামত পর্যন্ত কোনো দিনও যোগ্য লোক খলিফা হতে পারবে না, রাজার বেটা রাজা হবে, তা সে যত খারাপ লোকই হোক না কেন। এমনকি হযরত নূহ (আ)-এর ছেলে কিনানের মতো লোকও যদি হয় তবে সে হবে রাজার বেটা রাজা বা গদ্দিনশিন খলিফা। যোগ্য লোকও খলিফা হওয়ার পথ চিরদিনের জন্যে বন্ধ হয়ে যাবে।

২নং রাজতন্ত্র কায়েম হলে খেলাফত আমলের ন্যায় আর বাক স্বাধীনতা থাকবে না, যেমন– খলিফা হযরত ওমর (রা) একদিন ইমামতি করতে যাচ্ছিলেন আর সাথে সাথে পিছন থেকে একজন মুসল্লি খলিফা হযরত ওমর (রা)-কে বললেন, নামাযের নিয়ত করার পূর্বে আমার প্রশ্নের সঠিক এবং সন্তোষজনক জবাব দিন নইলে আপনার পিছনে নামায পড়ব না, খলিফা হযরত ওমর (রা) ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, কি আপনার প্রশ্ন, মুক্তাদি বললেন ইয়ামেন থেকে যে কাপড় পাওয়া গেছে তাতে কারো একটা পুরো জামা হলো না আর দেখছি সেই কাপড়েরই তৈরি একটা লম্বা জামা আপনার গায়ে এটা কি করে হল তার জবাব আগে দিন, তারপর ইমামতি করুন। পরে জবাব পেলেন যে, হযরত ওমর (রা)-এর ছেলে আবদুর রহমান এবং খলিফা স্বয়ং যে দু'জনে দুই টুকরা কাপড় পেয়েছিলেন তাই দিয়ে একটা জামা তৈরি হয়েছে। ছেলে তার কাপড়ের টুকরা তার আব্বাকে এজন্যে দিয়েছে যে, তার আব্বাকে ইমামতি করতে হয় কিন্তু কোনো ভাল জামা নেই, তাই। এরপর গ্রহণযোগ্য এবং সন্তোষজনক জবাব পাওয়ার পরই মুক্তাদি বললেন, এবার আপনি ইমামতি করুন। এ ঘটনার উল্লেখ করে ইমাম হুসাইন (রা) বললেন, রাজতন্ত্র কায়েম হলে খলিফার নিকট এভাবে কেউ আর কোনো কৈফিয়ত চাইতে পারবে না এবং বাক স্বাধীনতা চিরদিনের জন্যে শেষ হয়ে যাবে।

www.pathagar.com

৩নং হযরত ওমর (রা)-এর ছেলে যখন তালি দেয়া জামা গায়ে দিয়ে মক্তবে পড়তে গিয়েছে তখন অন্য ছাত্ররা খলিফার ছেলের গায়ের জামার তালি গুনেছে, দেখেছে ১৪টা তালি দেয়া জামা গায়ে দিয়ে হযরত ওমর (রা)-এর ছেলে পড়তে গিয়েছে। ১৪টা তালির মধ্যে আবার একটা তালি ছিল পাতলা চামড়ার। অন্য ছাত্ররা যখন তালি দেখে হাসাহাসি করেছে আর বলেছে খলিফার ছেলের গায়ে ১৪টা তালিওয়ালা জামা তখন ছেলে লজ্জা অনুভব করে বাড়ী গিয়ে মার কাছে তালি গুনার কথা বলেছে। মা পরে স্বামীকে বলেছেন যে, মক্তবের ছেলেরা ছেলের জামার তালি গুনেছে। সে নতুন জামা না হলে মক্তবে পড়তে যেতে চাচ্ছে না। হযরত ওমর (রা) তখন বাইতুলমালের রক্ষক খাজাঞ্জির কাছে গিয়ে বাইতুলমাল থেকে কিছু দেরহাম ধার চাইলেন, বললেন আগামী মাসে ভাতা থেকে এ ধার পরিশোধ করে দেব। খাজাঞ্চি বা ট্রেজারার বললেন, আপনি কি এ নিশ্চয়তা দিতে পারেন যে, আগামী মাসের ভাতা পাওনা হওয়া পর্যন্ত আপনি বাঁচবেন এবং আপনার ভাতা পাওনা হবে। হযরত ওমর (রা) বললেন না, সে গ্যারান্টি আমি দিতে পারি না, এরপর ট্রেজারার জিজ্ঞেস করল; এটা তো আল্লাহর সম্পদ এবং জনগণের আমানত, এখান থেকে ধার নিয়ে যদি পরিশোধ না করেই আপনি মরে যান তবে আপনার কি এ ভরসা আছে যে, কিয়ামতের দিনে আপনার দেশের প্রত্যেকটি নাগরিক যাদের আমানত থেকে আপনি ধার নিতে চাচ্ছেন এরা সবাই (পরকালে) আপনাকে মাফ করে দেবে? হযরত ওমর (রা) বললেন, এ ভরসাও আমার নেই। তখন ট্রেজারার বললেন, তাহলে আপনিই চিন্তা করুন আল্লাহর সম্পদ এবং জনগণের আমানত এর থেকে আপনি কি করে ধার নিতে পারেন আর জনগণের আমানত থেকে কি করেইবা ধার দেয়া যায় আর ধার দেয়ার অধিকারইবা কার আছে? তখন হযরত ওমর (রা) ট্রেজারারের উপর অত্যন্ত খুশী হলেন এবং বললেন, তুমি আমাকে অতি উত্তম নসিহত করেছ এজন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তিনি ধার নিলেন না। একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইমাম হুসাইন (রা) বললেন, খিলাফত আমলে খলিফাগণ যেমন রাজকোষের একটা নয়া পয়সাতেও হাত দিতে সাহস পায়নি এবং তারা মন থেকেই মেনে নিয়েছিলেন যে, রাজকোষের মাল বা অর্থ– এটার মালিক কোনো ব্যক্তি বিশেষ নয়, এর মালিক দেশের সমস্ত নাগরিক। অর্থাৎ এটা আল্লাহর সম্পদ এবং জনগণের আমানত। কাজেই কোনো খলিফাই এ অর্থে হাত দেননি কিন্তু রাজতন্ত্র যদি কায়েম হয়ে যায় তবে এ অর্থকে আর কোনো রাজাই আল্লাহর সম্পদ ও জনগণের আমানত মনে করবে না, তারা ওটাকে নিজের সম্পদ মনে করে তা দিয়ে যা খুশী তা করবে। তিনি আরো মনে করিয়ে ছিলেন যে, হযরত

www.pathagar.com

আবু বকর সিদ্দিক (রা)-এর খেলাফত আমলে একদিন তাঁর সামনে কিছু ভাল খাবার আসল। তিনি ভাবলেন অন্য কোনো বাড়ী থেকে বোধ হয় এসেছে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এ ভাল খাবার কোথায় পেলে? বাড়ীর ভিতর থেকে জবাব এল, "আপনি বাজারের জন্যে যে টাকা দিয়ে থাকেন তার থেকে প্রত্যেক মাসে কিছু কিছু করে বাঁচিয়ে কয়েক মাসে সঞ্চিত পয়সায় যখন দেখলাম যে আজ একটু মিষ্টি মিঠাইয়ের ব্যবস্থা করা যাবে তখনই এ মিষ্টান্য জাতীয় কিছু বাড়তি খাবারের ব্যবস্থা করেছি। তিনি শুনে ভয়ে কেঁপে উঠলেন যে, আমার তো পয়সা জমানোর মতো ভাতা নেয়ার কথা নয়। আমি ভাতা নেব সেই পরিমাণ যা দিয়ে আমার দেশের সবচেয়ে গরীবের সংসার যেভাবে চলে সেভাবে চলার মতো অর্থ। তিনি হিসাব নিলেন প্রতি মাসে তোমরা কয় দেরহাম জমাতে, হিসাব নিয়ে তৎক্ষণাত বাইতুলমালের রক্ষকের নিকট চিঠি লিখলেন যে, আমার ভাতা বেশী নেয়া হয়ে যাচ্ছে, আগামী মাস থেকে আমার ভাতা এত পরিমাণ কমিয়ে দেবে নইলে আল্লাহর কাছে আমার কৈফিয়ত দিতে হবে যে, যে ধরনের খাদ্য তোমার দেশের অন্যান্য সাধারণ নাগরিকের জুটতে পারেনি তুমি তাদের আমীর হয়ে তাদের চেয়ে ভাল খাবার কেন খেলে, তখন আল্লাহর কাছে আমার কোনোই জবাব থাকবে না। হযরত হুসাইন (রা) সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, যদি খিলাফত শেষ হয়ে যায় আর মুলুকিয়াত এসে যায় বা রাজতন্ত্র কায়েম হয় তাহলে কোনো রাজা বাদশাই আর এরূপ বাইতুলমালের অর্থ খরচ করতে ভয় পাবে না, রবং তারা বাইতুলমালের অর্থকে তাদের নিজের অর্থ মনে করবে।

৪নং ঃ এরপর বুঝালেন রাজতন্ত্র কায়েম হয়ে গেলে আল্লাহর আইন কোনো রাজাই বহাল রাখতে পারবে না, কারণ আল্লাহর আইনেই যখন রাজতন্ত্র নেই তখন তাকে রাজ আসনে টিকে থাকতে হলে আল্লাহর আইন পরিবর্তন করে তার রাজ আসনে টিকে থাকার মতো আইন করতেই হবে এবং আল্লাহর আইন তারা বাতিল করেই ছাড়বে। তখন রাষ্ট্রের আইন হবে এক প্রকার আর আল্লাহর আইন থাকবে ভিন্ন প্রকার, তখন মানুষ আল্লাহর আইনের পরিবর্তে রাজার আইন মেনে চলতে বাধ্য হবে। আল্লাহর আইন মেনে চলার কোনো পরিবেশই সমাজে থাকবে না।

এ ব্যাপারে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিচ্ছি, দেখুন ইংরেজরা ইমাম হুসাইন (রা)-এর জীবনদানের ব্যাপারটা গোপন করে মুসলমানদের উপর কি আইন চালু করে গেছে তার সামান্য কিছু বলব। তাতেই অনুমান করা যাবে যে, আল্লাহর আইন মেনে চলার পরিবেশ সমাজে আছে কি নেই। আমি এ পর্যন্ত লিখে আসার পর আমার একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল সেই ঘটনার মধ্যে

www.pathagar.com

বুদ্ধিমানদের জন্যে অনেক কিছু বুঝবার মতো আছে তাই বলছি। আমি সাধারণত কোথাও ওয়াজ করতে গেলে মানুষের ভুল ভাঙ্গার জন্যে কিছু প্রশ্ন করি। একদিন একস্থানে ওয়াজ করতে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, প্রিয় শ্রোতা ভাইসব আপনারা আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিন তারপর আমি আমার আলোচনা শুরু করব, আমি প্রশ্ন করলাম, "যারা আল্লাহর হুকুম মানে না, তাদের কথা বা যারা কুরআনের আইন মানে না তাদের কথাও বাদ দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করতে চাই যে, আমাদের এ সমাজের কোনো মুসলমান যদি কুরআনের পথে চলতে চায় তবে তাকে কি কেউ বাধা দেয়? এমন লোক কি আমাদের সমাজে আছে বলে আপনারা মনে করেন যে কুরআনের হুকুম মতো একজন জীবনযাপন করতে চাইবে আর কেউ তাকে বাধা দেবে না? তখন উপস্থিত সবাই বললেন যে, না এমন কোনো লোক এ সমাজে নেই যে, কেউ কুরআনের আইন মুতাবিক জীবন-যাপন করতে চাইলে তাকে বাধা দেবে, আর এমন মুসলমান তো থাকতেই পারে না। তখন আমি বললাম যারা এ কথায় একমত যে, কুরআনী আইন মুতাবিক কেউ জীবন-যাপন করতে চাইলে তাকে বাধা দেয়ার মতো কোনো লোক এ সমাজে নেই তারা মেহেরবানি করে একটু হাত উঁচু করে দেখান, আমি একটু দেখতে চাই কি পরিমাণ লোক এ কথায় একমত পোষণ করেন। এরপর দেখলাম সাধারণ লোক তো সবাই এমনকি যেসব আলেম সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাদের ২/১ জন বাদে আর আলেমও হাত উঁচু করে এ কথার সমর্থন জানালেন। এরপর আমি বললাম যে, প্রিয় দ্বীনি ভাইসব! আমরা যে মাঝে মাঝে ওয়াজ মাহফিলের আয়োজন করি, এতে টাকা পয়সাও ব্যয় করি, এতে আমাদের তো উদ্দেশ্য এটাই যে, ইসলাম আমরা শিখব, ইসলামের যা জানি না তা জানব এবং ইসলামের কোনো দিক সম্পর্কে যদি আমাদের কোনো ভুল ধারণা থাকে তবে তা ওয়ায়েজীনদের কুরআন হাদীস ভিত্তিক আলোচনা শুনে সংশোধন করে নেব। এই তো আমাদের উদ্দেশ্য? সম্মতি জানালেন যে, হাঁ এইটাই আমাদের উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্যে আমরা ওয়াজ মাহফিল করি এবং ওয়াজ শুনি। পরে আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, ইসলামের যে কোনো দিক সম্পর্কে আমাদের যদি কোনো ভুল ধারণা থেকে থাকে আর তা যদি আমি বাস্তব যুক্তির দ্বারা সে ভুল কে ধরিয়ে দেই তাহলে ভুলকে ভুল বলে স্বীকার করতে কোনো আপত্তি নেই তো? এতে সবাই বললেন যে, না, আমাদের কোনো ভুল থাকলে আর আপনি যুক্তির মাধ্যমে তা ধরিয়ে দিলে আমরা অবশ্যই তা মেনে নেব। তখন আমি এক এক করে কিছু কথা বললাম– সেগুলো আপনাদেরও বলে শুনাই। এরপর আমি প্রথমেই

www.pathagar.com

জিজ্ঞেস করলাম, ইসলাম বলে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলতে, আপনি যদি একখানা গাড়ী নিয়ে রাস্তার ডান পাশ দিয়ে চলেন তাহলে ট্রাফিক পুলিশ কি আপনাকে বাধা দেবে না? সবাই বললেন হাঁ, বাধা দেবে, পরে জিজ্ঞেস করলাম আপনি যদি একজন বিপারপতি হন; আর আপনার কোর্টে যদি একটা চুরি মামলায় স্বাক্ষী প্রমাণ নিয়ে প্রমাণিত হয় যে, সে সত্যিই চুরি করেছে তাহলে আপনি কি কুরআনের নির্দেশ মুতাবিক চোরের হাত কেটে দিতে পারবেন, নাকি দেশের আইন আপনাকে হাত কাটতে বাধা দেবে? সবাই বললেন, হাঁ দেশের আইন বাধা দেবে, এভাবে জিজ্ঞেস করলাম কুরআন বলে ডাকাতের একপাশের হাত আর বিপরীত পাশের পা কেটে দাও, আপনি কোর্টের হাকিম হলে পারবেন কি ডাকাতের শাস্তি এক পাশের হাত ও বিপরীত পাশের পা কেটে দিতে? পারবেন কি কুরআনের হুকুম মুতাবিক জেনার শাস্তি দিতে? পারবেন কি মদখোরকে ইসলামী বিধান মুতাবিক শাস্তি দিতে? পারবেন কি সিনামা হল থেকে অশ্লীল ছায়াছবি দুর করতে? পারবেন কি কুরআনের বিধান মুতাবিক মেয়েদের পর্দা মেনে চলতে বাধ্য করতে? পারবেন কি বেআইনিভাবে অস্ত্র রাখার জন্যে যেখানে একজন প্রাক্তন প্রেসিডেন্টকে ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দিতে পারা যায় সেখানে পারবেন কি ছাত্রদের বেআইনি অস্ত্র রাখার দায়ে ১০ বছর কারাদণ্ড দিতে? পারবেন কি কুরআনের যাবতীয় আইন সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে? নাকি এতে বাধা দেয়ার মতো লোক অবশ্যই আসবে। তখন বললাম একটু আগে যে আপনারা বললেন, কুরআনের আদেশ মুতাবিক জীবন-যাপন করতে কোনো মুসলমানের পক্ষ থেকে কোনো বাধা আসবেই না, বরং কোনো হিন্দু বা কোনো খৃস্টান কেউই কুরআনী আইন মেনে চলতে বাধা দেবে না, এ মতের সমর্থনে এখানের অনেক আলেমও হাত উঁচু করে সমর্থন জানিয়েছিলেন। এখন নতুন করে ভেবে চিন্তে বলুন তো কুরআনি বিধান মুতাবিক চলতে কোনো বাধা আছে কি নেই? তখন সকলেই বললেন হাঁ, আছে। তখন আমি বললাম আপনাদের পূর্বের চিন্তা যে নির্ভুল ছিল না, এটা প্রমাণ হলো কি? সবাই জবাব দিলেন, হাঁ, আমরা পূর্বে এভাবে চিন্তা করিনি, তাই মনে করেছিলাম বোধ হয় কুরআনি আইন মেনে চলতে কোনো বাধা নেই। আমি সাধারণত মানুষের ভুল বিশ্বাস দূর করার জন্যে প্রশ্ন করি। এতে অনেক ব্যাপারে অযথা তর্কের সম্মুখীন হতে হয় না। যেমন একদিন একস্থানে (স্থানটা ঝিকরগাছা থেকে ৩/৪ মাইল দক্ষিণে জায়গাটার নাম মনে করতে পারছি না, সে প্রায় ১৫ বছর পূর্বের কথা)। ওয়াজ করছিলাম। এর মধ্যে হঠাৎ

www.pathagar.com

শ্রোতাদের মাঝখানে থেকে একজন উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করলেন "হুজুর আপনি কি পীর মানেন না?" আমি বললাম আমি মানি কি না তা পরে বলব আপনি মানেন কিনা এটা আগে শুনে নেই। আমি বললাম আমরা কি মানতে বাধ্য, যা না মানলে ঈমান থাকবে না তা তো আমাদের ঈমানের কালেমার মধ্যেই আছে। ঈমানের কালেমার সাথে কিছু কথা যোগ করে আমি পড়ছি, দেখুন আপনি ঈমানের কালেমার সাথে আমি যেটুকু যোগ করে পড়ব তা আপনি মানতে পারেন কি না, অতপর আমি পড়া শুরু করলাম "আমান্তু বিল্লাহি ওয়া মালায়িকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়া পীরিহি ওয়া মুরব্বিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খাইরিহি ওয়া শার্‌রিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বায়াছে বাদাল মাওত। আমি এ কালেমার সাথে দুটো গুরুত্বপূর্ণ কথা যোগ করেছি। কারণ যা মানি তা শুধু বাংলায় না বলে আরবীতে সে মানাটা স্বীকার করায় তো কোনো দোষ নেই। তাই এ কালেমার ভিতর যা মানি তাই শুধু যোগ করেছি যথা ওয়া পীরিহি ওয়া মুরব্বিহি, এ দুটো কথা যোগ করেছি। এবার আপনারা বলুন আমার এ বর্ধিত আকারের কালেমাটা আপনারা কজনে মানেন। যারা মানেন তারা একটু হাত উঁচু করে দেখান, তখন কেউ আর হাত তোলে না, যে প্রশ্ন করেছিল তাকে জিজ্ঞেস করলাম; কি ভাই আপনি কথা বলছেন না যে, আমি পীর শুধু মানা নয়, একেবারে যা যা মানতে হবে বলে ঈমানের কালেমার মধ্যে আছে তার সাথে পীর ও মুরব্বি মানব বলেই তো দুটো কথা যোগ করে দিয়েছিলাম। অর্থাৎ আমি কালেমার মাধ্যমে মানতে রাজীই ছিলাম, আপনি নিজেই তো আমার নতুন কালেমাকে স্বীকার করলেন না, এর অর্থ তো দাঁড়ায় যে আপনি নিজেই পীর ও মুরব্বি মানেন না। মানুষের ভুল এভাবেই ভাঙ্গা যায়। তাছাড়া একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তিও দিচ্ছি; দেখুন যে পানি রৌদ্রে আস্তে আস্তে গরম হয় তা কিন্তু হঠাৎ ঠাণ্ডা হয় না, তা যেমন আস্তে আস্তে গরম হয় তেমন ঠাণ্ডাও হয় খুব ধীরে ধীরে আর চুলায় পানি দিয়ে জ্বাল দিয়ে কয়েক মিনিটের মধ্যে পানি ফুটিয়ে ফেলুন। এরপর চুলা থেকে নামিয়ে রাখুন দেখবেন রোদে গরম হওয়া পানির চেয়ে অনেক পূর্বে আগুনে ফুটান পানি ঠাণ্ডা হয়ে যাবে। এর দ্বারা বুঝলেন যে ভুলটা ক্রমান্বয়ে ধীরে ধীরে বহুদিন ধরে মাথায় ঢুকে আছে তা হঠাৎ করে দূর হওয়ার মতো নয়। এভাবে কারবালার ঘটনাই নয় বহু বহু ব্যাপারে মুসলমানদের মগজে ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা রয়েছে যা হঠাৎ করে দূর হওয়ার মতো নয়। এসব ভুল রাসূল ﷺ -এর পর থেকেই মুসলমানদের মাথায় ঢোকা শুরু হয়েছে। এ একই ভুল ছিল সেই যুগের মুসলমানদের মধ্যে যে ইয়াজিদ খলিফা হলে তাতে ইসলামের কি আর ক্ষতি

www.pathagar.com

হবে কিন্তু ইমাম হুসাইন (রা) যখন চোখে আঙ্গুল দিয়ে এক এক করে দেখালেন তখন অনেকেরই ভুল ভাঙ্গল আর যাদের কিছু স্বার্থ ছিল ইয়াজিদ শাসনের মধ্যে তারা বুঝেও বুঝতে চাইল না। এরপর শুরু হল ইমাম বংশের উপর বিভিন্ন ধরনের নির্যাতন, তখন কুফায় গিয়ে নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ার আশ্বাসে তিনি বলে কয়েই মদীনা থেকে স্বপরিবারে এবং কিছু আপনজন যারা নির্যাতনের শিকার হয়েছিলেন তাঁদের সাথে নিয়ে প্রকাশ্যেই কুফার উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়লেন। এ বেরিয়ে পড়া কোনো পালিয়ে যাওয়া ছিল না, এটা ছিল প্রকাশ্য হিজরত। কাজেই এটা ইয়াজিদ বাহিনীর চোখ এড়িয়ে যাওয়া ছিল না, তাই তারা ইমামের পথে কারবালা প্রান্তরে বাধা দিল।

[আজ যেখানের নাম কারবালা ঐখানের নাম পূর্বে কারবালা ছিল না, এ নামটা হয়েছে তখন, যখন ইয়াজিদের লোকজন হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর গতিরোধ করে এবং ঐ কারবালায় তাদের আটকে বা চতুর্দিক থেকে ঘিরে ফেলা হয় তখন হযরত ইমাম হুসাইন (রা) পরিবার ও সাথী সঙ্গীদের উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন 'কারিবুলবালা' বা (তোমরা সাবধান) 'বিপদ নিকটবর্তী'। এরপর ঐ কারিবুল বালা শব্দটাকে একটু সহজ করে বা খাট করে এখন লেখা হয় কারবালা। সেই 'কুরব' কথাটায় যদিও ق বা বড় ক্বাফ ছিল আমরা যেটাকে বলি قريب সেটা ঐ ق দিয়ে লিখতে হয় কিন্তু এখন কথাটা আরো সহজ করে উচ্চারণের জন্যে ك বা ছোট কাফ দিয়ে কারবালা লেখা হয়।

হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-কে মেরে ফেলাই তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল না। তারা ভেবেছিল ফোরাতের পানি বন্ধ করে দিলে এবং বিভিন্ন কায়দায় ছোটখাট মারধর বা সঙ্গীদের ২/১ জনকে মেরে ফেললে চাপের মুখে শেষ পর্যন্ত হুসাইন (রা) হযরত ইয়াজিদকে খলিফা বলে স্বীকার করতেও পারে। এজন্য মুহাররম মাসের ৯ তারিখ পর্যন্ত ইয়াজিদের সৈন্য বাহিনী যত প্রকার সম্ভব চরম নির্যাতনের মাধ্যমে ইমাম হুসাইনের (রা) উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। ইয়াজিদের খিলাফতির স্বীকৃতি আদায়ের জন্যে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কোনো চাপের মুখেই তিনি নতি স্বীকার করলেন না। অতপর ৯ই মুহাররম বিকেল বেলা ইমাম হুসাইন (রা)-কে ইয়াজিদের লোক এক চরম পত্র দিয়ে দিল যে, আজকের দিন অর্থাৎ সামনের রাত– যেটা ছিল ৯ই মুহাররম দিবাগত রাত অর্থাৎ মুহাররমের ১০ তারিখের রাত যে ১০ তারিখকেই আরবীতে বলা হয় আশুরা। আশারা অর্থ ১০, তার থেকেই আশুরা বা ১০ই তারিখ। ঐ আশুরার রাতটুকু সর্বশেষ চিন্তা করার জন্যে ইমামকে সময় দেয়া হল এবং বলে দেয়া হল আগামীকাল সকালে

www.pathagar.com

আমরা সর্বশেষ জবাব চাই যে, আপনি ইয়াজিদকে খলিফা বলে মানবেন কি না। যদি মানেন তাহলে আপনার ও আপনার পরিবারের সবাইর জীবন নিরাপদ হবে। আর যদি না মানেন তাহলে আপনার ও আপনার পরিবারের সবাইর জীবন বিপন্ন হবে। তাই বুঝে সুঝে আগামীকাল এর জবাব দিবেন। তারা জান্‌ত যে, ইমাম হুসাইন (রা) যদি ইয়াজিদের খেলাফতির স্বীকৃতি না দেয় তবে আরবের অনেকেই ইয়াজিদকে খলিফা বলে মানবে না। এবং এতে আরবে একটা স্থায়ী অশান্তি বা গৃহযুদ্ধ নেমে আসবে যা প্রতিরোধ করা সহজ হবে না, তাই ইমাম হুসাইন (রা)-এর কাছ থেকে ইয়াজিদের খেলাফতির স্বীকৃতি নেয়াটাই ছিল ইয়াজিদের লোকদের প্রধান উদ্দেশ্য।

শেষ পর্যন্ত ইমাম বিপক্ষের চরম পত্র পেয়ে তাবুতে ফিরে গেলেন এবং পরিবারের সবাইকে নিয়ে আলোচনায় বসলেন, তিনি বললেন, শোন এবং চিন্তা করে জবাব দাও। আমাদের আজ রাতেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে, ইয়াজিদের খেলাফতির স্বীকৃতি দেব কি না, তিনি সবাইকে বুঝিয়ে বললেন, তাকে (ইয়াজিদকে) খলিফা বলে স্বীকার করে নিলে রাজতন্ত্রের মতো এমন একটা সর্বনাশা বিদয়াত ইসলামে ঢুকবে যার কারণে মুসলমান আর কোনো দিনও আল্লাহর আইন মেনে চলার পরিবেশ পাবে না। রাজার আইন আর আল্লাহর আইন কখনই এক হতে পারে না, ফলে যেখানেই রাজ আইন হবে ইসলামের বিপরীত সেখানেই মানুষ রাজ আইন মেনে চলবে, আল্লাহর আইন মেনে চলতে পারবে না। এবং কয়েক যুগ পরে মানুষের (মুসলমানদের) মনে এমন একটা ধারণা বদ্ধমুল হয়ে যাবে যে, শুধু নামায রোযা করলে আর ইসলামের কিছু আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন মেনে চললেই পুরা ইসলাম পালন করা হয়ে যাবে। রাষ্ট্রীয় আইনও যে কুরআন হাদীস মুতাবিক হতে হবে তা মুসলমানদের মন থেকেই ক্রমান্বয়ে মুছে যাবে। যার নযীর আমি একটু পূর্বেই বলেছি যে, এক ওয়াজ মাহফিলের উপস্থিত কিছু আলেমের মগজেও এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে গেছে যে, আমরা কুরআনি আইন ঠিকই মেনে চলতে পারি। ইমাম হুসাইন (রা) পরিবারদের বুঝালেন এভাবে মুসলমানরা জাতে মুসলমান থাকলেও ইসলামী বিধান মুতাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে না। তাই এসব চিন্তাভাবনা করে স্থির মাথায় চিন্তা করে বল আমাদের এ মুহূর্তে ইসলামের মধ্যে রাজতন্ত্রের মতো ইসলাম বিধ্বংসী বড় ধরনের একটা বিদয়াত ঢুকিয়ে জীবন বাঁচাব না কি ইসলামকে বিদয়াত মুক্ত রেখে বা ইসলামকে ইসলামের সঠিক অবস্থানে রেখে জীবন দান করব। এরপর সবাই স্থির মস্তিষ্কে চিন্তাভাবনা

www.pathagar.com

করে সিদ্ধান্ত নিলেন যে, ইসলামকে ইসলামের স্থানে রেখে অর্থাৎ ইসলামকে রাজতন্ত্রের মতো একটা বড় ধরনের ইসলাম বিধ্বংসী বিদ্আত থেকে মুক্ত রেখে আমরা জীবন দেয়ারই সিদ্ধান্ত নিলাম।

ইমামের স্বপ্ন

এমন সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কি আর কারো চোখে ঘুম আসার কথা? সবাই আহাজারী করে রাত কাটাচ্ছেন। হঠাৎ ভোর রাতে ইমাম হুসাইন (রা)-এর চোখে একটু তন্দ্রার ভাব আসছে, অর্থাৎ আধা ঘুম ধরনের অবস্থা; তার মধ্যেই তিনি স্বপ্নে দেখছেন যে, রাসূল ﷺ (তাঁর নানা) এসে তাবুতে ঢুকলেন, হাতে এক গ্লাস বেহেশতি সরবত। তিনি বললেন, হুসাইন তোমরা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছ তা অতি উত্তম সিদ্ধান্ত। আল্লাহ তোমাদের উপর খুশী, আমিও তোমাদের সিদ্ধান্তে খুশী, তোমরা ইসলামকে ইসলামের স্থানে বহাল রাখার জন্যে যে জীবনদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছ এটাই হচ্ছে ঈমানের মজবুতির লক্ষণ। হুজুর ﷺ বললেন, হুসাইন তুমি পিপাসায় কষ্ট পাচ্ছ। আগামীকাল শুক্রবার মাগরিবের পূর্বেই তোমাকে এ সরবত পান করাব। তুমি চিন্তা কর না ভীত হয়ো না, আগামীকালই তুমি আমার কোলে এসে যাচ্ছ। এরপর স্বপ্নে দেখেন নানার পিছনে মা, মায়ের পিছনে আব্বা, আব্বার পিছনে বড় ভাই। তাঁরা প্রত্যেকেই পৃথক পৃথকভাবে ইমাম হুসাইন (রা)-কে বলছেন একই কথা যে, আগামীকাল তুমি আমাদের কোলে এসে যাচ্ছ। স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। তিনি জেগেই নানা হযরত মুহাম্মদ ﷺ -এর স্বপ্নের ভবিষ্যত বাণী সবাইকে শুনিয়ে দিলেন এবং বললেন আমার শাহাদাতের খবর হয়ে গেছে। কিন্তু তোমাদের সম্পর্কে কোনো ভবিষ্যতবাণী পাইনি। কাজেই তোমরা হয়ত জীবনে বেঁচেও যেতে পার কিন্তু আমার জীবনে আগামীকাল আর সন্ধ্যা আসবে না। পরদিন তিনি পরিবারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন এবং বললেন আমার চেহারাও তোমরা এখন এ দুনিয়ার জীবনের মতো শেষ দেখা দেখে লও আর আমিও এ দুনিয়ার জীবনের মতো তোমাদের চেহারা শেষ দেখা দেখে নিলাম। আর পরকালে তোমাদের চেহারা দেখব, তোমরাও আমার চেহারা পরকালে দেখবে। তিনি জীবনের মতো পরিবারের লোকদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

তিনি গিয়ে তাঁদের রাতের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে দিলেন যে, ইসলামকে বাঁচানর জন্যে আমরা আমাদের জীবন দেব কিন্তু আমার মুখ দিয়ে এমন কথা

www.pathagar.com

স্বীকার করব না, যার কারণে ভবিষ্যত দুনিয়ার মানুষ পরিপূর্ণ ইসলামের উপর টিকতে পারবে না। তখন এক ব্যক্তির সাথে শুরু হল এক রাজশক্তির চরম যুদ্ধ। ইমাম হুসাইন (রা) বললেন, আমি জানি যে, আমি শহীদ হব তবে যতক্ষণ পর্যন্ত আমার হাত থেকে তরবারী আপ্‌সে পড়ে না যাবে আর যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আপসে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে না যাব ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাব। আমি বাতিলের কাছে আত্মসমর্পন করব না, আমি এমনিতেই ঘাড়টা এলিয়ে দেব না যে, তোমরা ঘাড়টা কেটে নিয়ে যাও। আমি যুদ্ধ করব ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না গায়ের রক্ত ঝরে শেষ হয় এবং গায়ে যতক্ষণ শক্তি থাকে। অতপর আসরের নামাযের দ্বিতীয় ওয়াক্তে ইমাম হুসাইন (রা) -এর হাত থেকে তরবারী পড়ে গেল তিনিও ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে গেলেন। এরপর যা হল তা সবাইর জানা।

এখন আমার প্রশ্ন, হযরত হুসাইন (রা)ও যে বেহেশতে যেতে চান আমরাও সেই বেহেশতে যেতে চাই কিন্তু যেখানে তিনি একটা মাত্র বিদয়াতকে প্রতিরোধ করার জন্যে জীবন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন সেখানে আমরা সমাজে কি দেখছি, কত হাজারো বিদয়াত হতে দেখছি, কত কুফরী শেরেকী আজ মুসলিম সমাজে ঢুকে পড়েছে, ইসলামী আইন, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা, ইসলামী চরিত্র, ইসলামী তাহ্‌জীব তামাদ্দুনের কিছুই আর বাকি নেই। সেখানে আমরা কি সমাজে ইসলাম কায়েম করার জন্যে জীবন দেয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারি না? আজ কারবালার আসল ঘটনাকে কালো পর্দা দিয়ে যে ঢেকে দিয়েছে সে কালো পর্দা কি আজও আমরা উন্মোচন করতে পেরেছি? পেরেছি কি আশুরার রাতের পটকা বাজি ফুটানোর মতো মারাত্মক কবীরা গোনাহের হাত থেকে সমাজকে উদ্ধার করতে? পেরেছি কি কারবালার ফতোয়া মুসলিম সমাজকে জানাতে ও বুঝাতে? পেরেছি কি নিজেরাও বুঝতে?

তাহলে এবার বলুন মুহাররমের মূল শিক্ষা কি? এর মুল শিক্ষা কি এ নয় যে, জীবন দেব তবুও সামাজে একচুল পরিমাণও গায়ের ইসলামী ব্যবস্থাপনা টিকতে দেব না, এ জন্যে কি শুধু ইসলামী ছাত্র শিবিরের নিরীহ ছেলেরাই জীবন দেবে? আর কি জামায়াতের কিছু কর্মীই জীবন দেবে? আজ দেশে তের কোটি মুসলমান থাকতে তাদের সামনে কিছু ছেলেরা জীবন দিচ্ছে আর সামাজের পীর সুফী দরবেশ চুপচাপ বসে তামাশা দেখছেন? দেখতে থাকুন, পরকাল আসতে আর বেশী দেরী নেই। সেই দিন আল্লাহর নিকট কি জবাব দেব এবং ইমাম হুসাইন (রা), তাঁর বড় ভাই, আর এ যুগের বগুড়ার আব্দুল

www.pathagar.com

মালেক থেকে শুরু করে আজ বরিশালের গোলাম ফারুক পর্যন্ত যারা শহীদ হলেন তাদের সামনে কি করে মুখ দেখাব? গোলাম ফারুক যিনি বরিশাল মেডিকেল কলেজের একজন উন্নত মেধার সৎ চরিত্রবান ছাত্র ছিলেন। তার অপরাধ যে তিনি ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী ছিলেন। তাই তাকে ইসলামের কারণেই জীবন দিতে হল। আর গত ২৭শে মে ১৯৯১ তো মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী জীবন দেয়ার জন্যে প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর হায়াত রেখেছিল বলে তিনি বেঁচে গেলেন, হয়ত আল্লাহ তাঁর দ্বারা ইসলামের আরো কিছু কাজ নিবেন বলেই সেদিন আল্লাহ তার শাহাদাত কবুল করেননি। বাইতুশ শরফের পীর সাহেবের ছেলেও ইসলামী আন্দোলন তথা ইসলামী ছাত্র শিবিরের কর্মী হওয়ার কারণে তাঁকেও আকালে জীবন দিতে হলো। কিয়ামতে তো এদের সাথে অবশ্যই আমাদের দেখা হবে, তখন এদের কাছে আমরা কি জবাব দেব এবং কি করে তাদের সামনে পরকালে এ মুখ দেখাব, তা কি কখনও আমরা চিন্তা করে থাকি?

জান বাঁচান কি ফরয?

'জান বাঁচান ফরয' কথাটা সমাজে এমনভাবে চালু হয়ে গেছে যে, আমাদের সমাজের উচ্চ শিক্ষিত লোকগুলোও মনে করেন 'জান বাঁচান ফরয' কথাটা সব ক্ষেত্রেই সমানভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু যেখানে ঈমানের প্রশ্ন সেখানে জান বাঁচান ফরয নয়, বরং জান দেয়া যে ফরয তা আমরা খোদ আল্লাহর কুরআন থেকেই তার স্পষ্ট দলীল পেয়েছি। যা এ পুস্তিকার শুরুতেই আলোচনা করা হয়েছে। এবার আরো চিন্তা করুন।

১। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে আগুনে পোড়ানর যখন সিদ্ধান্ত হয়ে গেল, তখন কোন্ কারণে পুড়ে মরতে প্রস্তুত হলেন কিন্তু নমরূদের কাছে আত্মসমর্পণ করলেন না? কারণ তো একটাই যে, তিনি জান রক্ষার চেয়ে ঈমান রক্ষার গুরুত্ব অনেক অনেক গুণ বেশী বলে মানতেন। এরপরও প্রশ্ন থেকে যায় ফেরেশতারা হযরত ইবরাহীম (আ)-কে সাহায্য করতে চেয়েছিলেন, তিনি তাদের সাহায্য নিতে রাজী হলেন না কেন? এর এটাই একমাত্র জবাব যে, তিনি আল্লাহর সাহায্য ছাড়া আর কারো সাহায্যকে বড় মনে করেননি। আর তিনি জানতেন যে, মূল সাহায্যকারী আল্লাহ, আল্লাহ কাউকে সাহায্য করলে তিনি ফেরেশতাদের মাধ্যম ছাড়াও সাহায্য করতে পারেন এবং ফেরেশতাদের কিছু করার জন্যে হুকুম করতেও পারেন। কাজেই ইবাদাত করবো যার,

www.pathagar.com

সাহায্য চাইব তাঁরই কাছে, একথা সব নবীই সমানভাবে বিশ্বাস করেছেন, আর এরই শিক্ষা দেয়া হয়েছে সুরা ফাতেহার মধ্যে اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنَ -এর মাধ্যমে যে হে আল্লাহ আমরা তোমারই ইবাদত করি এবং (যেহেতু তোমারই ইবাদত করি তাই) তোমারই সাহায্য চাই।

এরপরও চিন্তা করুন কত নবী ঈমান রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দিয়েছেন। কুরআন এ সম্পর্কে বলে يَقْتُلُوْنَ النَّبِيِّنَ بِغَيْرِ الْحَقِّ তারা নবীদেরকে অন্যায়ভাবে হত্যা করেছে। এভাবে দুই একজন নবীই যে শহীদ হয়েছেন তা নয়– বরং তাফসীরে মাআরেফুল কুরআনে আছে বনি ইসরাঈলের বিদ্রোহীরা তাদের ৩০ হাজারেরও বেশী নবীকে হত্যা করেছে। আর কুরআনে নবী কথাটা একবচনে বলেননি, বলেছেন বহুবচনে। কাজেই আল্-কুরআনের স্পষ্ট আয়াত দ্বারা প্রমাণিত যে, ইসলাম বিরোধীরা বহু নবীকেই হত্যা করেছে। তাঁদের সংখ্যা যাই হোক না কেন, আল্লাহর স্পষ্ট কথা যে, বহু নবীকে তারা হত্যা করেছে। এখন প্রশ্ন এসব নবীগণ কি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কোনো হুকুম পেয়েছিলেন যে জান বাঁচান ফরয? কাজেই যেভাবেই হোক জান বাঁচাও। না, তা পাননি, বরং পেয়েছেন যে ঈমান রক্ষার্থে প্রয়োজন হলে জান দেয়া ফরয। এ জন্যেই তো ইমাম হুসাইন (রা) যখন বুঝেছিলেন, এখন আর আমার জান রক্ষা করা ফরয নেই। এখন জান দেয়া ফরয হয়ে পড়েছে তখনই তিনি জান দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন এবং জান দিলেনও।

ইমাম হুসাইনের রক্তে লেখা ফতোয়া

ইমাম হুসাইন (রা) তার দেহের সবটুকু রক্ত দিয়ে কারবালার মাঠে লিখে গেলেন যে ফতোয়া তাহলো–

(১) ইসলাম খিলাফাত ছাড়া মানে না রাজতন্ত্রসহ কোনো ধরনেরই রাষ্ট্র ব্যবস্থা।

(২) আর ফতোয়া দিলেন কুরআন হাদীস থেকে যে, যা ইল্‌ম শিক্ষালাভ করেছ তা প্রকাশ করার জন্যে দেহের সবটুকু রক্ত ঢেলে দিয়েও যেন তা প্রকাশ করো। জান বাঁচানর বা কোনো স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে জানা ইল্‌ম গোপন করো না।

রাসূলের ﷺ প্রাণ প্রিয় নাতির পবিত্র দেহের রক্ত দিয়ে লেখা অমোচনীয় ফতোয়ার যারা কোনো গুরুত্ব দেবে না, তারা পরকালের জবাবদিহির জন্যে প্রস্তুত থেকো।

www.pathagar.com

ইমামের ফতোয়ার ফলাফল

ইমাম হুসাইন (রা) তার পবিত্র দেহের রক্ত তথা তাঁর মহা মূল্যবান জীবন দিয়ে, গায়ের শেষ রক্ত বিন্দু পর্যন্ত আল্লাহর জমিনে বইয়ে দিয়ে যে ফতোয়া দিয়ে গিয়েছেন সেই ফতোয়া মুতাবিক কাজ করতে গিয়ে ১৮৩১ সালে বালাকোটের মাঠে এক রাতে ৬ হাজার আলেম শহীদ হয়েছিলেন। এ ফতোয়া মুতাবিক কাজ করতে মিশরের 'ইখ্ওয়ানুল মুসলেমীনের' নেতা হাসানুল বান্না সহ বহু দামী দামী লোক জীবন দিয়েছেন। এ ফতোয়া মুতাবিক কাজ করতে গিয়ে মরহুম আল্লামা আবুল আ'লা মওদূদী (রা) ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলে জীবন দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এ ফতোয়াকেই কার্যকর করার জন্যে বাংলাদেশেও গড়ে উঠেছে ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামী নামে, আর ছাত্রদের মধ্যে ইসলামী ছাত্রশিবির নামে। ফলে ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর দেহের সবটুকু রক্ত দিয়ে যে ফতোয়া দিয়ে গিয়েছেন সেই ফতোয়া মুতাবিক চলতে গিয়ে আজ শিবিরের ছেলেদের এভাবে জীবন দিতে হচ্ছে।

আমি শিবিরের ছেলেদের বলছি, তোমরা যারা জীবনকে বাজি রেখে ইসলামী আন্দোলন করে যাচ্ছ এবং দলে দলে জীবন দিচ্ছ তারা যে ইমাম হুসাইন (রা)-এর মর্যাদা পাচ্ছ তা তোমরা অবশ্যই বিশ্বাস কর কিন্তু যারা তোমাদের মারছে তারা তোমাদের মর্যাদা কতো বৃদ্ধি করে দিচ্ছে তারা যদি চোখে তা দেখতে পেত যে, তোমরা যারা শহীদ হচ্ছো তারা যে চিরজীবন ও চির যৌবন লাভ করছো এবং তোমাদের পিতা মাতাকে যে কিয়ামতের মাঠে সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী করে যাচ্ছে তা বুঝতেছে না তারা, যারা তোমাদের জীবন নিচ্ছে। শহীদের পিতা মাতার প্রতি আমার নিবেদন যে, আপনার কোনো ছেলে যদি ইসলামী আন্দোলন করে শহীদ হয় আর আপনি যদি ছবর করতে পারেন, তবে দেখবেন পরকালের মাঠে আপনারা যে মর্যাদা পাবেন শহীদের পিতা মাতা হয়ে সে মর্যাদা একমাত্র আল্লাহর নবী রসূল ﷺ ছাড়া আর কারো ভাগ্যে জুটবে না, কাজেই আপনারা ছবর করুন, ফরয ওয়াজিব সুন্নাত মেনে জীবন-যাপন করুন, ইসলামী আন্দোলনে শরীক হয়ে যান, তাহলে দেখবেন পরকালে আপনাদের মর্যাদা আল্লাহ কত হাজার হাজার গুণ বৃদ্ধি করে দিবেন। দেখবেন আপনাদের দেখে কত মা বাপ আফসোস করবে এই বলে যে, হায়রে যদি আমার ছেলে মেয়েদের ইসলামী আন্দোলনে শামিল করে দিতাম তবে আজ কতই না মর্যাদা পেতাম। শিবির ও শিবিরের পিতা মাতাদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

আমার এক স্বপ্নের কথা না বলে মনকে মানাতে পারছি না। তাই বলছি, আমি এক শিবির কর্মী যেদিন শাহাদাত বরণ করে সে দিনই দিনগত রাতে তাকে স্বপ্নে দেখলাম। সে সোনালি রং এর একটা ঘরের মধ্যে রয়েছে। আমাকে দেখেই বলছে আমি মরিনি, আমি বেঁচে আছি এবং এতো আরামে আছি যা আপনারা কল্পনাও করতে পারেন না। দেখলাম তার চেহারা পূর্বের চেয়ে অনেক গুণ সুন্দর হয়েছে এবং এটাও দেখলাম যেন সে কবরে ঢুকে যাচ্ছে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তুমি মাটির মধ্যে ঢুকছ কেন, সে বলল (এ কথাটা আমার অস্পষ্ট মনে পড়ছে, পূর্বের কথাগুলোর মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। আমার মনে হচ্ছে যেন সে আমার কথার জবাবে হাসছিল এটা আমার ভালই মনে পড়ছে। কিন্তু কথাটা মনে হচ্ছে এই বললো যে, "এটা রীতি মুতাবিক মাটির ভিতরে ঢুকছি, এখনই বেরিয়ে আসব। এ স্বপ্নের কথা যখনই মনে পড়ে তখনই মনে হয় যেন আল্লাহ আমাকে স্বপ্নে একটা বেহেশতি ঘর দেখিয়েছেন। সে দৃশ্য যখনই মনে পড়ে তখনই যেন চোখের সামনে তা ভেসে ওঠে। (স্বপ্নের কাহিনীর মধ্যে যেন যোগ বিয়োগের কোনো ঘটনা না ঘটে সেই জন্যে আমি আবারও বলছি, সে যখন কবরে ঢুকছিল তখন যে কথাটা বলতে বলতে ঢুকল ঐ কথাটা শুনতে শুনতেই আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। ঘুম থেকে জেগেই যেন মনে হল সে বলে গেল যে, এটা রীতি মুতাবিকই কবরে ঢুকছি এখনই বেরিয়ে আসব") তবে সে যে বলল আমি মরিনি, বেঁচে আছি, আমি অনেক শান্তি বা আরামে আছি, আর ঘরের রং এবং তার উজ্জ্বল চেহারা এটা যে স্বপ্নে স্পষ্ট দেখেছি এ দেখার মধ্যে কোনো অস্পষ্টতা নেই। কাজেই শিবিরের ছেলেদের বলছি, তোমরা যদি শহীদ হও তবে আল্লাহর নিকট যে কি পুরস্কার পাবে তা দুনিয়ায় বেঁচে থাকতে আমরা তো কল্পনাও করতে পারি না, তা তোমাদেরই এক শহীদ ভাইয়ের কাছ থেকে আমি স্বপ্নে শুনেছি। আর আমার এ স্বপ্নের সাথে কুরআনের ঐ কথার হুবহু মিল রয়েছে যেখানে আল্লাহ বলেছেন, যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না, তারা জীবিত।" আল্লাহ আমাকে দেখালেন সত্যিই তারা জীবিত।

তোমাদের জন্যে আমার আর একটি আবেদন যে, তোমাদের হত্যার বিচার কেউ করবে না, কাজেই বিচার চেয়েও একমাত্র আল্লাহর কাছে। দুনিয়ায় কেউ তোমাদের বিচার করবে না বরং এখানে মরতেও হবে তোমাদের, আর আসামীও হতে হবে তোমাদের। এজন্যে দুঃখীত হয়ো না। তোমাদের বিচারের জন্যে উচ্চতর একটা আদালত রয়েছে। তবে মার খেয়ে এ দুনিয়ার আদালতে মামলা দায়ের করবা ঠিকই। কিন্তু এ মামলা এজন্যে

www.pathagar.com

করো না যে, এখানে বিচার পাবে, মামলা করবে এজন্যে যে, এ দুনিয়ার সরকারকেও যেন পরকালের উচ্চতর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পার। বিচার পাওয়ার নিয়তে বিচার চেও না। তবে বিচারকগণের মধ্যে ২/১ জন বিচারক এখনও আছেন যারা পরকালের উচ্চতর আদালতে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে চান না। তাঁদের আদালতে হয়ত বিচার পেতেও পার কিন্তু কোনো সরকারই, তোমাদের আন্দোলন চায় না এবং তারা মনে মনে চায়, তোমরা মরে কমে যাও, আর তাদের গদিটা পাকাপোক্ত হোক। যেমন ইয়াজিদ চেয়েছিল, ইমাম বংশ ধ্বংস হোক আর তার গদিটা পাকাপোক্ত হোক। ঠিক সে একই কায়দায় ইসলামী সরকার কায়েম হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কোনো সরকারই তোমাদের পক্ষে কথা বলবে না, এ বিশ্বাস ১০০% মনে রেখেই যার যার ঈমানী দায়িত্ব পালন করে যাবে। এটাই তোমাদের প্রতি আমার শেষ আবেদন। আল্লাহ তোমাদের সাথে রয়েছেন এ বিশ্বাসও তোমরা সর্বক্ষণ মনে স্থান দিও। আল্লাহ তোমাদের একমাত্র সহায়, দুনিয়ার কোনো শক্তি নয়। এ বিশ্বাস রেখেই সামনে এগুতে থাকবে। আমি তোমাদের মন থেকে ভালবাসি বলেই তোমাদের উদ্দেশ্যে কিছু কথা বললাম। আমি কে তা তোমাদের চেনার দরকার নেই। আমি তোমাদের একজন শুভাকাংখী। শুধু আমি নই তোমাদের বহু আপনজন আছে এ বাংলাদেশে যাদের তোমরা চেন না, একদিন আমি ইন্‌কাম ট্যাক্সের একজন সিনিয়ার জয়েন্ট কমিশনার, বাড়ী বরিশালের মেহেন্দিগঞ্জে তাঁর সাথে দেখা করতে গেলাম। তাঁর আগের দিনই চাটগার একজন শিবির কর্মীর শহীদ হওয়ার খবর তিনি সংগ্রামে পড়েছেন। তিনি কথা প্রসঙ্গে বললেন, আমি আজ রাতে ঘুমাতে পারিনি দুঃখে চিন্তায়, পরানপোড়ায়। তাঁর চাহুনির দিকে নজর করে আমার মনের অগোচরে চোখে পানি এসে গেল এ চিন্তায় যে, যারা সরকারী চাকুরীতে বড় বড় উচ্চ পদে চাকুরী করেন তাদের মধ্যেও শিবিরের দরদী আছে। তখন মনে পড়ল প্রায় ৫০ বছর আগের একটা কথা। সে আমার ছাত্র জীবনের কথা। তখন আমি কলকাতায় ছাত্র জীবন কাটাচ্ছিলাম। একদিনকার কথা এখনো কাটায় কাটায় নির্ভুলভাবে মনে আছে। একদিন আমি যাচ্ছিলাম ধর্মতলা থেকে খিদিরপুরের দিকে। হঠাৎ ভেসে আসল কার যেন কণ্ঠস্বর থেকে একটা গান-যার মাত্র ১টা ছন্দই আমার মনে তীরের মতো বিদ্ধ হয়ে গেল যা আজও (সে কথার তীর) মন থেকে বের হয়নি, সে ছন্দটা হল।

মোর মনের পথে যার আসা যাওয়া
তার বাকি থাকে কি আপন হওয়া?

www.pathagar.com

তাই শিবিরদের কথা যাদের মনের পথে সবসময় আসা যাওয়া করে তাদের জন্যে শিবিরদের আপন হওয়া কি বাকি থাকে? মনে পড়ল সেদিন সেই অফিসার সাহেবের চোখের পানি দেখে, যাদের সাথে কোনো রক্ত সম্পর্ক নেই, যাদের চোখেও তিনি কোনো দিন দেখেননি। তাদের জন্যে যাঁরা কাঁদে, তাদের জন্যে যাদের রাতে ঘুম হয় না, তারা কি করে এদের এত আপন মনে করে? মনে করে তো এ কারণেই যে, তাদের কাজের জন্যে অনেকেরই মনের পথে তাদের সর্বক্ষণই আসা যাওয়া তাই তাদের বাকি থাকে কি আপন হওয়া?

এ প্রসঙ্গে আমি কিছু লিখব এটা আমি এ বইয়ের অর্ধেকেরও যখন বেশী লেখা হয়ে গেছে তখনও ভাবিনি যে, এ প্রসঙ্গে কিছু লিখব। উপরের আপন হওয়া' পর্যন্ত লিখে কলম উঁচু করে অনেকক্ষণ ভাবলাম, আমি একি পাগলের মতো খানিক অপ্রাসঙ্গিক কথা লিখলাম, ভাবলাম এ প্রসঙ্গটা বাদ দেই। এরপর ভাবলাম যা লিখে ফেলেছি তা থেকেই যাক। তাই লিখে আর কাটাকাটি করলাম না।

শিবির! তোমাদের কথা মনে পড়লে আমার কথা শেষ হয়েও হতে চায় না, আমার এ দোষ আমি ঢাকব কি দিয়ে, কিছুই তো পাইনে যে তাই দিয়ে ঢাকি। তাই আবল তাবল অনেক কিছু বললাম। আমি দেখছি আমার আরো একটা বলার মতো শেষ কথা আছে তা না বলে কলমকে থামাতে পারলাম না, তাহলো শয়তান তোমাদের কাজ থেকে ফিরানর জন্যে বার বার তোমাদের মনে নানান ধরনের ওয়াসওয়াসা দেবে। আর শয়তানকে আল্ কুরআনে বলা হয়েছে খান্নাস অর্থাৎ যে বারবার ওয়াসওয়াসা দেয়ার জন্যে ফিরে আসে। সে কারো ব্যাপারে নিরাশ হয় না। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত প্রত্যেকের কাছে সে ওয়াসওয়াসা দিতে বার বার আসে আর সে কারো সম্পর্কে নিরাশ হয় না। সে প্রতিটি মানুষের শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত চেষ্টা করে যায় মানুষকে দোযখী করার জন্যে। বিশেষ করে ইসলামী আন্দোলনের কর্মীদের কাছে শয়তান বাব বার বহুবার শুধু ওয়াসওয়াসা দিতে আসতেই থাকে। কাজেই তোমরা যেন কখনো শয়তানের ধোঁকায় পড়ে না যাও সেদিকে সদা সর্বদা সতর্ক থাকবে এবং মরার ভয়ে যেন আন্দোলন থেকে পিছিয়ে না পড়। শয়তানের ধোঁকার হাত থেকে বাঁচার জন্যে নিজেদেরকে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক রাখবে। আর মনে মনে একটু ভেবে দেখবে যে শয়তান মানুষকে দোযখী বানানর জন্যে যত চেষ্টা করে এবং শয়তানি দাওয়াত সে যেমন বার বার মানুষের কাছে নিয়ে যায়। তোমরা কি তার মতো কর্মী হতে পেরেছ? তোমরা অন্যান্য ছাত্রদের বেহেশতি বানানর

www.pathagar.com

জন্যে এবং তাদের ইসলামী আন্দোলনে ভিড়ানর জন্যে? চিন্তা করে দেখত শয়তানের কাছাকাছি চেষ্টাও করতে পার কি না? চিন্তা করে দেখত শয়তানের মতো বড় কর্মী তোমরা কখন হতে পেরেছ। তার চেষ্টা দোযখী বানানর জন্যে আর তোমাদের চেষ্টা বেহেশতী বানানর জন্যে। কাজেই তোমাদের কাজের মর্যাদা আল্লাহর কাছে যে কতো বেশী তা আমার সাধ্য কি যে আমার কলমে লিখে বুঝাতে পারি? তা অবশ্যই বুঝতে পারবে পরকালে।

আমি আশুরার রাতকে সামনে করে (মুহাররমের ৯ তারিখে লিখছি) তোমাদের প্রতি আমার আকুল আবেদন রাখছি যে, তোমরা এ আশুরার রাতে বা এ ঘটনাটা পড়ার পরে মনে মনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে ইমাম হুসাইন (রা)-এর ন্যায় মরতেও প্রস্তুত কিন্তু ইসলামী সমাজব্যবস্থা ছাড়া অন্য যে কোনো ধরনের সমাজব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রব্যবস্থা কিছুতেই মেনে নেবে না। আমিও তোমাদের সাথে সিদ্ধান্ত নিচ্ছি যে, আল্লাহর ইচ্ছায় আমার উপরও জীবন দেয়ার মতো পরিস্থিতি আসলেও যেন আমি জিহাদের ময়দান না ছাড়ি। তবে তোমাদের মতো তরবারি নিয়ে যুদ্ধ করার বয়স আমার নেই। আমার জিহাদ আমি কলম দিয়েই জারি রেখেছি। আমি আল্লাহর কাছে এ দোয়াই করি যেন আল্লাহ তোমাদের ইমাম হুসাইনের (রা) মতো বীর মুজাহিদ বানিয়ে দেন এবং তোমরা জীবন দিয়েও যেন এদেশে ইসলাম কায়েম করতে পার।

একটি কৈফিয়ত

"মোর মনের পাথে যার আসা যাওয়া
তার বাকি থাকে কি আপন হওয়া"।

কথাটা কেন সেদিন আমার মনের মধ্যে তীরের মতো বিদ্ধ হয়েছিল তার কারণ না বললে অনেকেই মনে করবেন এ কথার মধ্যে এমন কি আছে যার জন্যে কথাটা মনের মধ্যে তীরের মতো বিদ্ধ হল, তাই কারণটা সংক্ষেপে বলছি যেটা একেবারেই অপ্রাসঙ্গিক। আশা করি কেউ কিছু মনে করবেন না।

আমার তো পাঠ্য জীবনের খুব অভাবে দিন কেটেছে তাই আল্লাহ কলকাতায় পড়ার সময় এমন একটা ওসিলা করেছিলেন যে হঠাৎ এমন একটা লজিং মিলে গেল, যাদের কোনো সন্তান ছিল না কিন্তু খুব ধনী লোক ছিল। তাঁরা আমাকে কত যে আপন জানত এবং মনে করতো তাদের সবকিছুতেই যেন আমার অংশ আছে। আমাকে তারা ঠিক নিজের ছেলের মতো মনে করতো এবং আমার পড়ার খরচ বহন করতো। আমি তাদের ছেলে হওয়ার

www.pathagar.com

কারণে, আমি কারো ভাইপো হতাম, কারো ভাগ্না হতাম, কারো ভাই হতাম আর তাদের একটা পোষা মেয়ের আমি মামাও হতাম। সেই মেয়ের যেদিন যাদবপুর (কলকাতা থেকে বেহালা যাওয়ার পথে যাদবপুর) বিয়ে হল সেদিন সাথে যাওয়ার জন্যে সিদ্ধান্ত হল যে, মামাই সাথে যাবে। আমি মামা তার প্রথম শ্বশুর বাড়ী যাওয়ার দিন মেয়ের পক্ষ থেকে আমিই সাথে গেলাম। মেয়েও মনে করতো আমি তার আপন মামা, আর বর পক্ষও জানত না আমি তার কেমন মামা। সেই ভাগ্নিকে নিয়ে বাড়ী ফিরে আসার মাত্র কয়েক দিন পরেই ঐ গানের ছন্দটা আমার কানে ভেসে এল। তখন হঠাৎ মনে হল, আমি কোথায় যশোরের মানুষ, যাদের সাথে আমার কোনো রক্ত সম্পর্ক নেই, আমি তাদের ছেলে, ভাই, ভাইপো, মামা আরো কত কি। তারা আমার কেন আপন, আর আমিবা তাদের কেন এত আপন। কারণ তো একটাই যে, মোর মনের পথে যার আসা যাওয়া তার বাকি থাকে কি আপন হওয়া। তাদের কথা মনে হলে এখনও মন কাঁদে তাদের কত আপন ছিলাম, আর আজ তারা কোথায়? সে একই কথা মনে পড়ে যখন ভাবি যে, আজইবা কেন তাদের জন্যে মন কাঁদে এবং কেন তাদেরকে এত আপন মনে হয় যাদের কারো সাথে কোনো রক্ত সম্পর্ক নেই এবং যাদের কারো বাড়ী টেকনাফ আর কারো বাড়ী তেতুলিয়া আর কারো বাড়ী নবীনগর আর কারো বাড়ী রসূলপুর? কারণ তো একটাই, এক অভিন্ন বিশ্বাস ও এক অভিন্ন মতাদর্শের অনুসারী হওয়ার কারণে সর্বদাই মনের পথে তাদের আসা যাওয়া তাই বাকি নেই তাদের আপন হওয়া। কারণ আমার মনের পথে তোমাদেরও আসা যাওয়া প্রতিনিয়ত। তোমাদের জন্যে মন খুলে দোয়া করি। এরপরও আল্ কুরআন থেকে তোমাদের দুটো আয়াত ব্যাখ্যা সহকারে শুনাব। যা তোমাদের জন্যে খাস করে আর সবার জন্যে সাধারণভাবে। এবার আয়াত দুটির দিকে লক্ষ্য কর এবং আল্লাহর কথাকে আল্লাহর কথা হিসাবে বুঝার চেষ্টা কর। প্রথম শোন সূরা বাকারার ১৫৪নং আয়াতে কি বলছেন। আল্লাহ বলছেন-যারা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয় তারা মরে না।

সুরা বাকারার ১৫৪ নং আয়াত ঃ

وَلاَ تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُقْتَلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتَ بَلْ اَحْيَاءَ وَلٰكِنْ لاَ تَشْعُرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে তোমরা মৃত বল না, বরং তারা জীবিত। কিন্তু (তারা যে কিভাবে জীবিত রয়েছে) সে অনুভূতি তোমাদের নেই; বলছেন খোদ আল্লাহ তাঁর পাক কালামে কোনো অস্পষ্ট ভাষায় নয় একেবারে স্পষ্ট ভাষায়।"

www.pathagar.com

এরপর লক্ষণীয় যে, যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবন দেয় তাদেরকে বলা হয় শহীদ। আরবীতে 'শাহেদ' অর্থ সাক্ষদাতা আর শহীদ অর্থ সর্ব্বাপেক্ষা বড় সাক্ষদাতা যার সাক্ষের কোনো তুলনা নেই। এখন প্রশ্ন যারা আল্লাহর রাস্তায় জীবনদান করে তারা কিসের সর্বাপেক্ষা বড় সাক্ষদাতা? তারা হচ্ছেন এ কথার সাক্ষ্যদাতা যে খেলাফাত ছাড়া ইসলাম যে অন্য কোনো রাষ্ট্রব্যবস্থাই সমর্থন করতে পারে না, তা যে সাহাবীগণ জীবন বিলিয়ে দিয়ে সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। ইমাম হুসাইনও (রা) যে সাক্ষী দিলেন জীবনদান করে ঠিক এ সাক্ষী দিয়ে যাচ্ছে তারা সবাই যারা ইসলামী হুকুমতের দাবী তোলার কারণে নিহত হচ্ছেন, তারা প্রকৃতপক্ষে নিহত হচ্ছেন এক চরম সাক্ষ্য রেখে। তারা লোক চক্ষুর অন্তরালে গিয়ে এমন এক জীবন লাভ করছেন যা শহীদগণই শহীদ হওয়ার পর অনুভব করতে পারব? পারব না বলেই আল্লাহ বলেছেন যে সম্পর্কে তোমাদের لَا تَشْعُرُوْنَ কোনো অনুভূতি নেই বা সে সম্পর্কে তোমাদের বোধশক্তি নেই। এ অনুভূতি তাদেরই আছে যারা জীবনদান করে শহীদ হচ্ছেন। আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিচ্ছি, যেমন বাইতুশ শরফের পীর সাহেব জবরদস্ত আলেম এবং কামেল ব্যক্তিও। তা সত্ত্বেও তাঁর ছেলে পিতার চেয়ে খুব কম আলেম হয়েও শহীদ হয়ে যে অনুভূতি লাভ করেছে শহীদী চির যৌবন এবং চিরস্থায়ী জীবন সম্পর্কে, পিতা কামেল আলেম হয়েও সে অনুভূতি লাভ করতে পারেননি। কারণ তিনি এখনও আলামে বরযাখের জীবন স্বচক্ষে দেখেননি, তাই সঙ্গত কারণেই বলতে পারি যে, পিতার চেয়ে ঐ শহীদ পুত্র অনেক গুণ বড় আলেম, যে এলেম আমাদের কারুরই নেই, আছে শুধু শহীদদেরই।

শহীদদের বরযাখী জীবন

যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয় তাদেরকে শহীদ বলা হয় যা পূর্বেই বলা হয়েছে। তবে তাঁদের মৃত বলাও জায়েজ কিন্তু তাঁদের মৃত্যুকে এবং অন্যান্যদের মৃত্যুকে একই পর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কারণ মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযাখী জীবন লাভ করে, তা সে সাধারণ নেককার হোক বা আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হোক বা কোনো গোনাহগার হোক এবং বরযাখী জীবনে বরযাখের বাসিন্দারা তাদের আমল অনুযায়ী হয় শান্তির অথবা শান্তির জীবন লাভ করে। কিন্তু কুরআন ও হাদীসের মর্মানুযায়ী শহীদদের সেখানে অন্যান্যদের তুলনায় এক বিশেষ বৈশিষ্টপূর্ণ মর্যাদা দেয়া হয়

www.pathagar.com

তা অনুভূতির বৈশিষ্ট। যেমন দুনিয়ার জীবনের সাথে একটা উদারণ দেয়া যায়, তা হচ্ছে প্রত্যেক মানুষের চুল, দাড়ী, গায়ের পশম, নখ, এগুলো মানব দেহের অংশ। কিন্তু এগুলোতে কোনো অনুভূতি নেই। অর্থাৎ এগুলো কেটে ফেললে তার শরীরে কোনো ব্যথা লাগে না। আবার দেখুন গায়ের গোড়ালির মোটা চামড়ায় একটা চিমটি কাটলে যতটুকু চিমটি কাটা অনুভূত হয় তার চেয়ে বেশী অনুভূত হয় যদি পায়ের উপরের পাতলা চামড়ায় চিমটি কাটা হয়, তেমন হাতের আঙ্গুলে পায়েব আঙ্গুলে বা আঙ্গুলের উপরের কিছুদূর পর্যন্ত মশায় কামড়ালে ঠিক যেমনটি অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় দেহের অন্যান্য জায়গায় মশায় কামড়ালে ঠিক ততটা যন্ত্রণা অসহ্য যন্ত্রণা অনুভূত হয় দেহের অন্যান্য জায়গায় মশায় কামড়ালে ঠিক ততটা যন্ত্রণা অনুভূত হয় না। এটা যেমন দুনিয়ার জীবনে আমরা দেখতে পাই। আবার এটাও দেখি একই রাস্তায় রৌদ্রে একজন সুস্থ সবল লোক রৌদ্রের মধ্যে মাইলের পর মাইল পথ হেটে যাচ্ছে, তার কাছে কোনো অস্বস্তি লাগে না, আর তারই সমবয়সি একজন দুর্বল ব্যক্তি ছাতাবিহীন ১০ হাত পথও হাটতে পারে না, এমনও দেখেছি যে, একই কাজে সবাইর অনুভূতি এক প্রকার নয়, ঠিক তদ্রুপ বাসে চলতে গিয়ে দেখি একজন বাসের ধূয়া বা ঝাকুনিতে বারবার বমি করে দিচ্ছে, অথচ তার চেয়ে দুর্বল এক ব্যক্তি ৮/১০ ঘন্টা বা তার চেয়েও বেশী সময় বাসে চলছে তার কাছে মোটেই কোনো অস্বস্থি অনুভূত হয় না, আবার দেখি কেউবা বাসের জানালার কাছে বসেও এমন অস্থির হয়ে পড়ে যেন তার পরিমিত অক্সিজেন সে পাচ্ছে না, আবার তারই সমবয়সী একজন বাসের ভীড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে কিন্তু তার নিকট মোটেই কোনো প্রকার অস্বস্তিবোধ হয় না ঠিক তেমনই অন্যান্য মৃতদের তুলনায় শহীদগণ বরযাখী জীবনে অত্যন্ত শান্তি এবং স্বস্তি অনুভব করবে। এমনকি শহীদদের বরযাখী জীবনের স্বস্তি এবং শান্তির অনুভূতি তার মৃত জড় দেহে পর্যন্ত অনুভূত হতে পারে। যেমন আপনি স্বপ্নে বাঘ দেখে যখন চিল্লিয়ে উঠেন যে চিল্লান আপনার ঘুমন্ত দেহের মুখ দিয়েও উচ্চারিত হয়ে পড়ে। আপনি জাগলে পাশের লোক যখন জিজ্ঞেস করে তুমি চিল্লিয়ে উঠলে কেন? তখন সে বলে আমি যেন দেখছিলাম চিড়িয়াখানায় গিয়েছি আর সেখান থেকে একটা বাঘ খাচা থেকে বেরিয়ে আমাকে আক্রমণ করতে আসছে তা দেখেই আমি চিল্লিয়ে উঠেছি। এটা যেমন রূহ দেখে এক স্থানে, আর তা অনুভূত হয় তার ঘুমন্ত জড় দেহে। ঠিক তেমনই কোনো কোনো শহীদের বরযাখী জীবনের শান্তি তার মৃত জড়দেহেও অনুভূত হতে পারে। কারণ, শহীদদের কথা হাদীসে আছে যে, তাদের দেহ মাটিতে নষ্ট হয় না, এটা বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় প্রমাণিত হয়েছে। আমাদের এ জীবনেও

www.pathagar.com

বহুবার শুনেছি যে, একটা সমতল জায়গায় একটা নতুন কবর খুড়তে গিয়ে এমন মরা লাশ বেড়িয়ে পড়েছে যার দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় রয়েছে এমন কোনো পচা দুর্গন্ধের পরিবর্তে তার দেহ থেকে খোশবুও বের হয়েছে। এ সম্পর্কে কুরআনে দলীল আছে তা পরবর্তী আয়াতের ব্যাখ্যায় বলব ইনশাআল্লাহ।

আর নবী রসূলগণকে মোর্দ্দা বলাটাই নিষেধ। কারণ, তারা আল্লাহর দৃষ্টিতে জীবিত। এ জন্যেই তো কোনো নবীর স্ত্রীকে বিধবা বলে অন্যত্র নিকাহ দেয়া যাবে না। কারণ, নবীগণ তো মরেননি, কাজেই তাদের স্ত্রীগণ বিধবা নন এবং তারা অন্য স্বামীও গ্রহণ করতে পারেন না। সূরা আহযাবে এর সমর্থনে এক আয়াতাংশে বলা হয়েছে وَفِيْكُمْ رَسُوْلُ اللّٰه "এবং রসূল তোমাদের মধ্যে রয়েছেন"। কাজেই এ কুরআনি দলীল মুতাবিক আমাদের মানতেই হবে যে রসূল আমাদের মধ্যে রয়েছেন। এ রয়েছেন এর অর্থ যেন আমরা একথা মনে না করি যেন নবী জমিনের উপর দিয়ে অশরীরি একজন মানুষ হিসাবে একই সময় পৃথিবীর যে কোনো স্থানে মিলাদ পড়ার সময় উপস্থিত হন। কাজেই কোনো কোনো স্থানে রসূল ﷺ-এর বসার জন্যে সুন্দর করে চেয়ার সাজান থাকে, তারা বিশ্বাস করে এখানে রসূলুল্লাহ ﷺ এসে বসেন। এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ভুল ধারণা এবং এ ধরনের ভুল ধারণা এক পর্যায়ে মানুষকে মুশরিক পর্যন্ত করে ফেলতে পারে। রসূল আমাদের মধ্যে আছেন তার অর্থ শহীদগণের তুলনা বরযাখী জীবনে নবী রসূলগণের অনুভূতি এত তীব্রতর যে, দুনিয়ার জড় দেহেও তা অনুভূত হতে পারে। আর তা পারে শহীদদের তুলনায় অনেক বেশী। অথবা এমনও হতে পারে যে, আল্লাহর নবী রসূলগণ এমন এক অবস্থানে রয়েছেন যেখান থেকে অনায়াসে বরযাখ ও আলমে দুনিয়া একইভাবে দেখতে পান। আর এটাও জেনেও রাখা দরকার যে, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সংগ্রামে বা সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছে এবং তার নিয়ত এরূপ যে, এ সংগ্রামে যদি শাহাদাত সামনে এসে যায় তবে শহীদ হতে তার কোনো আপত্তি নেই। এ অবস্থায় তার যে কোনো ধরনের মৃত্যুকেই শাহাদতের মৃত্যু বলা যেতে পারে। এ ছাড়াও আল্লাহর সাধনায় লিপ্ত থাকেন কাজেই তাদের মৃত্যুকেও শহীদি মৃত্যু বলা যেতে পারে তবে অবশ্যই তাকে মানুষের দৃষ্টিতে নয় আল্লাহর দৃষ্টিতে কামেল বুযুর্গ ব্যক্তি হতে হবে। এরূপ ব্যক্তিগণের সাধারণ মৃত্যুও শাহাদাতের শামিল তবে প্রকৃত শহীদদের তুলনায় তাদের মর্যাদা কিছুটা কম হওয়ার কথা। কারণ স্পষ্ট ভাষায় আল্লাহর রাস্তায় কতল হওয়াদের অর্থাৎ যাদের গায়ের রক্ত ঝরেছে তাদের উচ্চ মর্যাদার কথা বলা হয়েছে।

www.pathagar.com

শহীদদের উচ্চ মর্যাদা

শহীদদের মর্যাদা যে আল্লাহর নিকট কত বেশী তা যারা শহীদ হয়েছেন তাঁরা সবচেয়ে ভাল জানেন। আর আমরা কুরআন হাদীস থেকে যা জানি তা মানি কিন্তু শহীদ না হয়ে শহীদের র্মযাদা মানাটার ধরণ কি রূপ তা একটা উদারহণ দিয়ে বলছি। মনে করুন এমন এক নতুন ধরনের নতুন স্বাদের মিষ্টি এসে হাজির করে বলা হল এটা এক নতুন স্বাদের এমন মিষ্টি যা তোমরা জীবনেও কোনো দিন খেয়ে দেখে উপলব্ধি করতে পার নি। এরপর উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে কেউ একজনকে বললেন যে, তুমি একটু খেয়ে দেখতো কেমন মিষ্টি, তখন একজন খেয়ে বললেন যে, আহ্ এতো সুস্বাদু যা জীবনেও এর পূর্বে কোনো দিন খেয়ে দেখিনি। তিনি খেয়ে দেখে বললেন, আর উপস্থিত সবাই তা বিশ্বাস করল যে, হাঁ এটা ঠিকই এক অপূর্ব স্বাদের মিষ্টি। খাওয়া লোকের কাছ থেকে শুনে এটা বিশ্বাস করা সহজ যে হাঁ ওটা খুবই মিষ্টি খাবার। কিন্তু কেমন মিষ্টি তা নিজে না খাওয়া পর্যন্ত বুঝা যায় না। এ কারণেই শহীদদের শান্তির কথা সম্পর্কে আল্লাহ যা বলেছেন, আমরা যে তা বিশ্বাস করব এটা আল্লাহ অব্যশই জানেন কিন্তু তার আসল স্বাদটা কেমন তা শহীদ না হওয়া পর্যন্ত বুঝা বা অনুভব করা যাবে না এবং তা অনুভব করা সম্ভবও নয়। তাই আল্লাহ বলেছেন যারা শহীদ হয়নি তারা لَا تَشْعُرُوْنَ তা অনুভব করতে পারে না।

আল্লাহর রসূল শহীদদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

১। শহীদরা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে।

২। তারা কিয়ামতের মাঠে রক্তমাখা শরীর নিয়ে উঠবে।

৩। শহীদদের রূহ মোর্দাদের ন্যায় গোসল দেয়া লাগে না। তাদের রক্ত ধুয়ে দেয়া যাবে না।

৪। শহীদদের রূহ কিয়ামত পর্যন্ত বেহেশতের মধ্যে পাখীর আকারে থাকবে এবং মনের সুখে বিচরণ করে বেড়াবে।

এ চারটি কথারই একটু সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দিচ্ছি। চিন্তা করতে বলব সবাইকে যে এ সম্পর্কীয় কুরআনের যাবতীয় ভাষ্য ও হাদীসের সাথে আমার ব্যাখ্যার মিল আছে কি নেই।

www.pathagar.com

১। শহীদদের কোনো বিচার হবে না, এর কারণ যাদের বিচার হবে তাদের এজন্যে বিচার হবে যে, তারা আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছে কি না, কিন্তু শহীদদের রক্তমাখা দেহই তো তার সাক্ষী (শহীদ) যে সে আল্লাহর দেয়া দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আল্লাহ্‌র দেয়া জীবনটাই সে আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দিয়েছে, কাজেই তাকে আর কিসের জন্যে প্রশ্ন করা লাগবে? প্রশ্ন করার কারণ তো তার জীবন দিয়ে সে শেষ করেই এসেছে। এখন তো তাকে করার মতো প্রশ্ন আর থাকে না। এজন্যেই বলা হয়েছে পরকালে তারা বিনা হিসাবে বেহেশতে যাবে।

২। তারা তো দেহ ছাড়া অবস্থায় শুধু রূহ নিয়েই বেহেশতে বাস করবে। কিন্তু কিয়ামত যেদিন হবে সেদিনই সব রূহকে তার দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। যা আল্লাহ বলেছেন ৩০ পারার সূরা তাকবীরের ৭নং আয়াতে।

وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ ـ

"আর যখন সমস্ত রূহগুলোকে তার দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে।" কাজেই শহীদদের রূহকে সেদিন রূহের বাহন দেহকে সাথে নেয়ার জন্যে কিয়ামতের মাঠে হাজির হতে হবে।

৩। তাদের গোসল দিতে হবে না, কারণ এ দেহের সেই রক্তসহ তাদের দেহকে কিয়ামতের মাঠে হাজির করা হবে কাজেই তা ধোয়া নিষেধ। তাদের দেহ যে মরে না তার জ্বলন্ত প্রমাণ পেয়েছি আমরা এই মাত্র বছর কয়েক পূর্বে। সে বেশীদিনকার কথা নয়। গত ১৯৮৮ সালের ২৮ শে সেপ্টেম্বর রোজ বুধবারের কথা। সিরাজগঞ্জের শহীদ মুহাম্মদ শাহাবাজ উদ্দিন সরকার। একজন প্রাক্তন মুক্তিযোদ্ধা পরে জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেছেন। এ অপরাধে তাকে চাইনিজ কুড়াল দিয়ে কাঠ কাটার মতো কেটে তার দেহ ও মাথাকে ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলল, তিনি আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হয়ে গেলেন। তার শাহাদাতের পুরা একদিন পরেও যখন তাকে দাফন করতে নেয়া হয় তখনও তার কফিন থেকে রক্ত ঝরছিল। এ বিজ্ঞানের কোন্ যুক্তিতে বলবে যে, মৃত দেহের রক্ত ২৪ ঘন্টার পরও তাজা রক্ত দেহ থেকে ঝরতে পারে? এ বিজ্ঞানের কোনো যুক্তি দিয়ে এর ব্যাখ্যা দেয়া যাবে না। এর ব্যাখ্যা একমাত্র কুরআন হাদীসে যে শুধু ২৪ বা ৪৮ ঘন্টাই তার রক্ত তাজা থাকে না, বরং তাঁর রক্ত ঐভাবেই তাজা থাকবে কিয়ামতের মাঠে ঐ দেহকে উঠান পর্যন্ত। শহীদ শাহাবাজের রক্ত কি বৃথা যাবে? তা যাবে না।

www.pathagar.com

তাঁর এক এক ফোটা রক্তের বদলে বাংলার শত শত ভাই, রণবেশে বলছে এর বদলা চাই বদলা চাই।

৪। শহীদদের রূহ বেহেশতের পাখীর আকারে থাকবে। এ পাখীর অর্থ আমাদের শালিক, দোয়েল, ময়না, টিয়া ইত্যাদি ধরনেরই যে পাখী তা হয়ত নাও হতে পারে। কারণ বাংলায় পাখী এবং উড়া বুঝানর জন্যে যেমন দুটো শব্দ আছে তেমন আরবীতে পাখী এবং উড়া বুঝানের জন্যে পৃথক কোনো শব্দ নেই।

যেমন طَيْرٌ অর্থ পাখী আর ঐ একই শব্দ থেকে طَيَّار অর্থ উড়োহাজাজ। কাজেই طَيْرٌ বললে এমন পাখী চিন্তা করা আমার মনে হয় জরুরী নয় যে তা দোয়েল ময়না বা টিয়া ধরনের কোনো দেহ বিশিষ্ট পাখী হতে হবে। বরং এটা বুঝালেই যথেষ্ট হয় যে বেহেশতের মধ্যে শহীদের রূহ পাখীর মতো উড়ে বেড়াতে পারবে যার পাখীর মতো দুটো পাখার প্রয়োজন। এখানে হাদীসের طَيْرٌ থেকে আমাদের এ পৃথিবীর মতো পাখী মনে না করে যদি শহীদদের রূহকে উড়ন্ত রূহ মনে করি অর্থাৎ طَيْرٌ থেকে যদি উড়ন্ত জীন মনে করি তাহলে শহীদদের রূহর একটা ভিন্ন দেহ ধারনের কোনো প্রয়োজন হয় না, আর প্রকৃতপক্ষে তাদেরকে জড় দেহের সাথে জোড়া হবে তখনই যখন কিয়ামত হবে। যে জন্যে আল্ কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে وَاِذَا النُّفُوْسُ زُوِّجَتْ অর্থাৎ প্রত্যেক রূহকে কিয়ামতের দিনই তার আসল দেহের সাথে জুড়ে দেয়া হবে। কাজেই تَطِيْرُ অর্থ 'উড়া' ধরলে আরবীতে শব্দের কোনো ভুল অর্থ হয় না, হয় না বলেই তো طَيَّار অর্থাৎ যে বেশী বেশী উড়ে, এ শব্দই ব্যবহার করলে আরবের লোক উড়ো জাহাজ বোঝে তাহলে শহীদদের রূহকে طَيْرٌ বললে দেহ বির্শিষ্ট কোনো পরিচিত বা অপরিচিত পাখীর আকৃতিতেই ধরে নিতে হবে এর কোনো যুক্তি আছে বলে আমার মনে হয় না। সে রূহের উড়ার মতো শক্তিসম্পন্ন করা হবে এতটুকু ধরে নিলেই আর আল্ করআনের ঐ আয়াতের সাথে যা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার সাথে কোনো বিরোধ সৃষ্টি হয় না। বরং মিল হয় পুরোপুরিই।

এরপরও আমার মনে হয় طَيْرٌ আরো ব্যাখ্যা আসা উচিত। কারণ যেখানে আমি যদি কোনো ভিন্ন মত পোষণ করি তাহলে কুরআনী দলীল দ্বারা আমাকেই তা প্রমাণ করতে হবে যে, আল্ কুরআনের বইরের কোনো ধারণা আমি মনে পোষণ করি না।

লক্ষ্য করুন আরবীতে طَيْرٌ বললে আমরা অর্থ করি পাখী কিন্তু বাংলার পাখী শব্দের সাথে কোনো বিভক্তি যোগ করা যায় কিন্তু পাখী শব্দকে কোনো

www.pathagar.com

ক্রীয়া পদের শব্দ বানান যায় না, অথচ আরবীর طَيَّار কে ক্রীয় পদে আল্ কুরআনেই ব্যবহার করা হয়েছে। অবশ্য طير মূল শব্দ থেকে তৈরী ২৯ টি শব্দ আল্ কুরআনে রয়েছে। তার একটি মাত্র আয়াতের দিকে লক্ষ্য করুন দেখুন সূরা আনয়ামের ৩৮ নং আয়াত যেখানে আল্লাহ বলছেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِىْ الْاَرْضِ وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ। জমিনে বিচরণ কোনো জীবজন্তু এবং আকাশে উড়ন্ত কোনো পাখী দেখ আমি তাদের নিয়তি নির্ধারণ করায় ত্রুটি রাখিনি। এখানে طيار শব্দ থেকে طٰئِرٍ বা উড়নেওয়ালা শব্দ তৈরী হয়েছে। এরপরই ঐ একই طَيَرٌ থেকে يَطِيْرُ বা উড়ে/ উড়িতেছে/ উড়িবে ইত্যাদি অর্থ দেয় يَطِيْرُ শব্দ। এ একই শব্দ থেকে تَطِيْرُ শব্দও তৈরী হতে পারে। এর অর্থও হবে সে (স্ত্রী) উড়ে উড়িবে/ উড়িতেছে অর্থ হতে পারে এবং তুমি, উড়ো/উড়িতেছ/ উড়িবে অর্থও হতে পারে। কিন্তু বাংলার পাখী শব্দ দিয়ে কি, পাখীতেছে /পাখীবে/পাখীল ইত্যাদি শব্দ বানান যাবে? (তা অবশ্যই যাবে না) আর তারা পাখীতেছে বললে কি কেউ বুঝবে যে পাখীতেছে অর্থ উড়িতেছে? এবং আরবীর طَيْرٌ শব্দ থেকেই طَيَار বা উড়োজাহাজ যার শাব্দিক অর্থ বাংলায় বলতে হলে طَيَّار -এর অর্থ বলতে বেশী বেশী উড়ার মতো যন্ত্র বললেন, কি মানুষ উড়োজাহাজ বুঝবে? তা কিছুতেই বুঝবে না।

এ একই শব্দ দিয়ে ২৯টি কথা আল্ কুরআনে আছে তার সবকটি আমি তুলে ধরব মনে করেছিলাম কিন্তু দেখলাম طَيْرٌ যে একটা ক্রীয়াবাচক বিশেষ্য পদ তা যখন একটি মাত্র আয়াত থেকে প্রমাণিত হয়ে গেল তখন এ কথা নিয়ে বই ভারী করার কোনো যুক্তি নেই। তাই এ বিষয়ে এখানেই শেষ করছি।

শহীদদের মৃত দেহ কি পচতে পারে?

হাদীসের ভাষায় শহীদদের দেহ পচে না, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণও আছে। তবে আছে এভাবে যে তাদের দেহ মাটিতে মিশে যায় না বা মাটিতে পচে না। কিন্তু যদি মাটির সাথে অন্য এমন কোনো বিষাক্ত পদার্থ থাকে বা এমন কোন ধাতব পদার্থ থাকে যার পদার্থ গুণই হচ্ছে এমন যে তা জীবিত মানব দেহের কোনো অংশে লাগলেও জীবিত মানুষেরই দেহের সে অংশ পচে যেতে পারে। যে রুগীকে বাঁচতে হলে সাথে সাথে পচা অংশ কেটে ফেলে দিলে খুত অবস্থায়ও সে লোক বেঁচে যেতে পারে। ঠিক সেরূপ মাটির মধ্যে এমন কোনো বিষাক্ত পদার্থ যদি থাকে যা জীবন্ত লোকের দেহের কোনো অংশে লাগলেও

www.pathagar.com

দেহের সে অংশে পচন ধরে, এরূপ কবরের মধ্যে জীবন্ত শহীদি জড় দেহে যদি তেমন কোনো বিষক্রিয়া ঘটে তবে শহীদের দেহও পচতে পারে তাই বলে তাকে যে প্রকৃত শহীদ বলা যাবে না তা নয়। এরূপ কোনো শহীদের দেহ পচলেও হাদীসের কথা অসত্য প্রমাণিত হবে না। তবে শহীদের নিয়তের মধ্যে যদি কোনো গলদ থাকে তবে সে ব্যক্তি প্রকৃত শহীদের মর্যাদা পাবে না। কারণ, প্রত্যেক আমলের ফল নিয়ত অনুযায়ী হয়ে থাকে। লাঠির আঘাতে বেদনা অনুভব করেন এবং অন্যান্য মানুষের ন্যায় যেমন নবী রসূল ﷺ গণ তরবারি আঘাতে নিহত হতে পারেন তেমন যে ধরনের বিষক্রিয়ায় একজন শহীদের লাশে পচন ধরতে পারে ঠিক সেই একই ধরনের বিষক্রিয়ায় নবী রসূলগণের দেহেও পচন ধরতে পারে। তবে সব স্থানের মাটির গুণাগুণ যেহেতু এক প্রকার নয়, তাই সব স্থানের কবরস্থ নবী রসূল ও শহীদানদের লাশের একই অবস্থা হতে পারে না। তাই বলে আমরা মরদেহ দেখেই কারো শাহাদাত বা বরযাখী জীবন সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করতে পারি না। অর্থাৎ শহীদ ও নবী রসূলগণের মরদেহে যদি কোনো বিকৃতি ঘটে তবে হাদীসের যথার্থতা বিঘ্নিত হয় না। তবে এটা ঠিক যে, সাধারণ মৃতের লাশ যেমন স্বাভাবিকভাবেই দ্রুত মাটিতে পচে যায় তেমন শহীদ বা নবী রসূলগণের মরদেহে কোনো বিষক্রিয়া হলেও তাদের দেহে তা সহজে ক্রিয়াশীল হতে পারে না। যেমন রসূল ﷺ-কে যাদু করলে তার ক্রিয়া দেখা দিয়েছিল প্রায় এক বছর পর। কিন্তু সাধারণ মানুষকে যাদু করলে সাথে সাথে তার ক্রীয়া পরিলক্ষিত হতো। এ যাদুর আসর যেমন নবী রসূলগণের উপর কার্যকর হলেও তা কিছুটা দেরীতে হয়। যেমন- হযরত আবু বকর সিদ্দিককে সাপে কামড়েছিল হিজরাতের রাতে আর সেই বিষের বিষক্রিয়া তার দেহে দেখা দিল রসূলুল্লাহ ﷺ-এর এ দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ারও কয়েক বছর পরে। ঠিক তদ্রূপ কোনো নবী রসূল বা কোনো শহীদের দেহে মাটির ভিতরকার কোনো বিষাক্ত পদার্থের প্রভাবে যদি পচন আসেও তবে তা আসে অনেক দেরীতে। এটা পরীক্ষিত সত্য। কাজেই হাদীসের বাণীর যথার্থতা এখানেই স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

অপর আয়াতে অর্থাৎ সূরা আনয়ামের ১৬৯ ও ১৭০নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন। শহীদরা মরে না, তারা আল্লাহর কাছ থেকে রুজী পায় ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۔ فَرِحِيْنَ بِمَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۔ اَنَّ اللّٰهَ لاَ يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۔

www.pathagar.com

অর্থঃ"আর যারা আল্লাহর রাস্তায় (ধর্মীয় কারণে) নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা তাদের রবের নিকট এক বিশেষ ধরায় জীবিত এবং রুজী প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে তাদের যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ ভোগ করছে। আর যারা এখনও (শহীদ হয়ে) তাদের নিকট এসে পৌঁছেনি তাদের পিছনে রয়েছে, তাদের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোনো ভয়ভীতিও নেই এবং কোনো চিন্তাভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের কারণে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের কাজের ফল বা পুরস্কার বিনষ্ট করবেন না।"

শব্দার্থ ঃ وَلاَ تَحسَبَنَّ -তুমি কখনো মনে করোনা, اَلَّذِينَ যারা قُتِلُوْا -নিহত হয়েছে فِيْ سَبِيلِ اللّٰه আল্লাহর রাস্তায় (ধর্মীয় কারণে) اَمْوَاتًا - মৃত بَل বরং اَحْيَاءٌ জীবিত عِنْدَ নিকটে رَبِّهِم তাদের রবের يُرْزَقُوْنَ - তারা রুজী প্রাপ্ত فَرِحِيْنَ -তার আনন্দিত بِمَا - যা اٰتَهُمُ اللّٰه আল্লাহ তাদের দান করেছেন। مِن فَضلِه - তার অনুগ্রহ থেকে (مِن - অর্থ থেকে) وَيَستَبْشِرُوْنَ - এবং তারা আনন্দ উদযাপন করে। بِالَّذِيْنَ -তাদের জন্যে لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ - যারা এখনো তাদের নিকট (শহীদ হয়ে) পৌঁছেনি। مِنْ خَلفِهِم -তাদের পিছন থেকে (তাদের সহকর্মীরাও যারা বেহেশতি আনন্দ ভোগ করার ব্যাপারে এখনো পিছনে রয়েছে। তারা তাদের সুখ-শান্তির কথা ভেবে মনে মনে আনন্দ পায় যে, আমাদের সহকর্মীরাও যদি একটু পরে হলেও এভাবে আমাদের সাথে এসে মিলিত হয় তবে তাদের সাথে পেয়ে আমরা আনন্দ লাভ করব। কিন্তু যারা এখনো শহীদ হয়নি, শহীদ হওয়ার ব্যাপারে পিছনে পড়ে আছে তারা বুঝতে পারছে না اَلاَّ خَوفٌ - যে (তারা শহীদ হলে) তাদের কোনো ভয় নেই। عَلَيهِم -তাদের জন্যে (ভয়ের কোনো কারণই নেই) وَلاَ هُم يَحزَنُونَ - এবং তাদের চিন্তা ভাবনারও কোনো কারণ নেই। يَستَبْشِرُوْنَ - তারা আনন্দ প্রকাশ করে بِنعمَةٌ - নিয়ামতের কারণ مِن اللّٰه - (যা পায়) আল্লাহর পক্ষ থেকে। وَفَضلٍ -এবং অনুগ্রহ (যা পায়) وَاَنَّ اللّٰهَ - আর অবশ্যই আল্লাহ لاَ يُضِيْعُ -ন ষ্ট করবেন না। اَجرَ - সৎকাজের পুরস্কার اَلْمُؤمِنِينَ - ঈমানদার লোকদের।

ব্যাখ্যা ঃ এর প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, হে রসূল তুমি কখনো মনে চিন্তা করো না যারা আল্লাহর দীনকে আল্লাহর জমিনে কায়েম করার জন্যে জঙ্গে বদর থেকে শুরু করে জঙ্গে ওহুদ পর্যন্ত (অর্থাৎ ওহুদ যুদ্ধে কিছু লোক শহীদ হওয়ার পর এ আয়াতগুলো নাযিল হয়) এবং এরপর কিয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীর যে কোনো অঞ্চলের যে কোনো ব্যক্তি যদি শহীদ হয় অর্থাৎ আল্লাহর

www.pathagar.com

রাস্তায় সংগ্রামরত অবস্থায় নিহত হয় তবে সে শহীদ। এবং সে এক বিশেষ ধারায় এক বিশেষ পদ্ধতিতে এমন এক জীবন লাভ করে যে জীবন-যাপনরত অবস্থার লোকদেরকে কখনো মোর্দা বলে চিন্তা করতে পার না। আল্লাহর নিকট থেকে এমন এক পদ্ধতিতে জীবন লাভ করে যা আমাদের জ্ঞানে না ধরা পড়লেও আল্লাহ তা দেখে থাকেন। এমনকি আল্লাহ বলছেন যে তারা আমার নিকট থেকে খাদ্যও পেয়ে থাকে অর্থাৎ দুনিয়ার জীবনে আল্লাহ যে পদ্ধতিতে আমাদের জীবিত রেখে আমাদের জীবিকা দিচ্ছেন, শহীদদেরকেও তাদের জীবনের নতুন পদ্ধতিতে যে ধরনের খাদ্য যে নিয়মে দেয়া প্রয়োজন তা সেই নিয়মে দিয়ে যাচ্ছেন, যা আল্লাহর কালামের স্পষ্ট ভাষা তাতে আমাদের জ্ঞানে ধরতেই হবে, এটা জরুরী না, জরুরী হচ্ছে এটা বিশ্বাস করা যে শহীদগণ অন্যান্য মৃতদের ন্যায় বরযাখী জীবন যাপন করে না। তারা এমনভাবে আলামে বরযাখে জীবন কাটায় যে জীবনের সাথে দুনিয়ার জীবনের অবশ্যই সাদৃশ্য রয়েছে যার কারণে আল্লাহ বলছেন যে, তোমরা চোখে না দেখলেও আমি আল্লাহ তা দেখে থাকি। এ ব্যাপারে যদিও আল্লাহ সূরা বাকারার পূর্বোল্লেখিত আয়াতে বলেছেন, لَا تَشْعُرُوْنَ তোমাদের অনুভূতি নেই। আমাদের অনুভূতি অবশ্যই নেই তবে আল্লাহ যখন আমাদের কিছু না কিছু জ্ঞানবুদ্ধি দিয়েছেন এবং চিন্তাভাবনা করে শিক্ষা লাভ করতে বলেছেন কাজেই আল্লাহর কথাকে বুঝার জন্যে চিন্তা করা তো কোনো দোষের কারণ নয়? আসুন কিছু বাস্তবতাকে সামনে রেখে চিন্তা করি যে, শহীদগণ কিভাবে জীবিত এবং কিভাবে তারা আল্লাহর নিকট থেকে রুজী পায়।

দেখুন এটা বহুবার প্রমাণ পাওয়া গেছে এবং বহু লোকে সচক্ষে দেখেছে এমন কি মাঝে মাঝে এ যামানায়ও খবরের কাগজে খবর বের হয় যে, অমুক স্থানে কবর খুড়তে গিয়ে এমন বহু পুরান মোর্দা কবরে পাওয়া গেছে যাদের দেহ সম্পূর্ণ অক্ষত অবস্থায় মানুষ সচক্ষে দেখতে পেরেছে।

এতে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে যে, মানুষ রোগ ব্যধির কারণে যদি রীতিমত পেট পুরে খেতে না পারে তাহলে তার দেহের গোশতের কোষগুলো ক্রমান্বয়ে ক্ষয় হয়ে হয়ে এমন হয়ে যায় যে, তার দেহের ওজনও যেমন কমে যায় তেমন মনে হয় যেন তার চামড়া হাড়ের সাথে লেগে গেছে, বুকের খাচার হাড়গুলো ভেসে ওঠে। কিন্তু পরে যখন সে সুস্থ হয় তখন পেটপুরে খেতে পারলে এবং তা যদি হজম হয় তাহলে অল্পদিনের মধ্যেই তার দেহে নতুন নতুন গোশতেরকোষ তৈরী হয়, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তার বুকের খাচার হাড়গুলো

www.pathagar.com

যেমন গোশতে ঢেকে যায় তেমন তার ওজনও বাড়ে। এই যখন প্রকৃত অবস্থা তখন এ প্রশ্নের কি জবাব আছে যে একজন মরা মানুষের লাশ বছরের পর বছর অক্ষত অবস্থায় থাকে? তার কি গোশতের কোষগুলো মরে নষ্ট হয় না এবং তার দেহের ক্ষয় পূরণ খাদ্য ছাড়া হয় কি করে? তখন আল্লাহর একথা মানতে হয় যে, নিশ্চয়ই আল্লাহ এমন এক পদ্ধতিতে তার খোরাক জোগাচ্ছেন যার কারণে তার গোস্তপেষির কোষগুলো এক দিকে কিছু মরে যাচ্ছে অপর দিকে তাকে যে খাদ্য দেয়া হয় তাতে তার দেহের ক্ষয় পূরণ হচ্ছে। ফলে সে দেহে পচনও ধরছে না এবং তার দেহ খাদ্যের অভাবে শুকিয়েও যাচ্ছে না।

জীব দেহ সম্পর্কে কিছু বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

জীব দেহের ক্ষয় ও খাদ্যের মাধ্যমে ক্ষয় পূরণটা কিভাবে হয়ে থাকে তার একটা উদাহরণ দিচ্ছি যে উদাহরণই নয় একটা অকাট্য যুক্তিও বটে।

আপনারা নদী দেখেছেন এবং যারা নদীর স্রোত দেখেছেন তারা কি কখনও একটা কথা ভেবে দেখেছেন যে, আজ সকালে আপনার বাড়ীর ঘাটে নদীতে যে পানি দেখছেন আগামীকাল আপনার ঘাটে পানি ঠিকই দেখবেন কিন্তু আগের দিন যে পানি দেখেছিলেন সে পানি যে আর জীবনেও কোনো দিন দেখবেন না তা কি কখনো চিন্তা করে দেখেছেন? আর আপনারা যারা পদ্মা, মেঘনা, যমুনা বা যে কোনো নদীর কোনো ঘাট দিয়ে বার বার পার হয়েছেন তারা কি কখনও চিন্তা করে দেখেছেন যে, ঘাট পূর্বেরটাই থাকে কিন্তু যে পানির উপর দিয়ে একবার পার হন সেই পানির উপর দিয়ে আর জীবনেও কোনো দিন পার হতে পারবেন না?

স্রোতওয়ালা নদীর অবস্থা হল এই যে, পানি অনবরত স্রোতে ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে এবং যেতে যেতে তা সমুদ্রে মিশে যাচ্ছে কিন্তু একদিকে ঠিক যতটুকু পানি ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে ঠিক ততটুকু পানি উজান থেকে এসে চলে যাওয়া পানির শূন্যস্থান পূরণ করছে। এ নদীরই অবস্থা এমন হয় যে, যদি ভাটির দিকে পানি বেশী যায় আর উজানের পানি কম আসে তাহলে নদীর পানি কমে যায়। কারণ যে পরিমাণ পানি ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে, সেই পরিমাণ উজান থেকে এসে পূরণ হচ্ছে না, তখন দেখি নদীর পানি কমছে। কিন্তু ঠিক যে পরিমাণ পানি ভাটির দিকে গড়ায় যদি ঠিক সেই পরিমাণ পানি উজান থেকে আসে তবে নদীর পানির উচ্চতায় কোনো কম বেশী হয় না।

www.pathagar.com

কারণ পানি যেটুকু ভাটিতে চলে যায় ঠিক সেই পানিই উজান থেকে এসে পড়ে। আর যদি এমন হয় যে, যে পরিমাণ ভাটির দিকে গড়ায় তার চেয়ে বেশী পরিমাণ পানি উজান থেকে আসে তবে নদী পানির উচ্চতা দেখা যায়। তখন আমরা বলি নদীতে পানি বেড়েছে। কিন্তু এ বাড়ার কারণটা এছাড়া আর কিছুই না যে, পানি যা ভাটির দিকে চলে যাচ্ছে তার চেয়ে বেশী পরিমাণ পানি উজান থেকে এসে পড়ছে।

ঠিক এ একই অবস্থা মানব দেহের। নদীর যেমন ঘাট ঠিকই একস্থানে থাকে কিন্তু পানি সর্বক্ষণ যাচ্ছে আর আসছে। ঠিক তেমনই মানব দেহের কাঠামো ঠিকই থাকে এবং উপরের চেহারা নদীর ঘাটের মতো ঠিকই আছে কিন্তু গোশতের কোষ প্রতিনিয়ত মরছে আর নতুন করে তৈরী হচ্ছে। যেমন নদীর পানি একদিকে ভাটিতে চলে যাচ্ছে অপরদিকে নতুন পানি উজান থেকে এসে তা পূরণ করছে। নদীর মতোই যদি মানব দেহের কোষ বেশী মরে আর তৈরী হয় কম তখন তার দেহের ওজনও কমে এবং তাকে ক্রমান্বয়ে শুকিয়ে যেতে দেখা যায়। আর দেহের কোষ ঠিক যে পরিমাণ কমে যদি ঠিক সেই পরিমাণই নতুন কোষ তৈরী হয় তবে দেহের ওজন একই প্রকার থাকে স্বাস্থ্যের বাড়তি ঘাটতি কোনোটাই হয় না। আর যদি দেহের কোষ যে পরিমাণ কমে তার চেয়ে বেশী বেশী নতুন কোষ তৈরী হয় তবে তার দেহের গোস্তও যেমন বাড়তে থাকবে তেমন তার ওজনও বাড়তে থাকবে।

মানব দেহের সাথে নদীর মিলটা হুবহু একই প্রকার। তাই আজ যে মানুষটাকে যে চেহারায় দেখছেন ১৫ দিন পরেও তাকে সেই চেহারাতেই দেখবেন কিন্তু তার দেহের ভিতরের গোস্ত কোষ ১৫ দিন পূর্বে যা ছিল ১৫ দিন পরে তা থাকে না। পূরাতনটা মরে যায় আর নতুনটা তৈরী হয়–যা সাধারণ লোকের চোখে ধরা পড়ে না, কিন্তু ডাক্তারের চোখে তা ধরা পড়ে। যেমন- নদীর ঘাটে জীবন ভরই পানি দেখে আসছি কিন্তু সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না যে, কাল যে পানি দেখেছিলাম আজ সে পানি নেই। এটা চিন্তাশীলদের জ্ঞানে ধরা পড়ে। যেমন দেহের কোষ ক্ষয় ও পূরণ ডাক্তাদের চোখে ধরা পড়ে।

এ আলোচনার পর এটা স্পষ্ট বুঝা গেল যে, শহীদদের লাশে যে কোনো পচন ধরে না এবং যার গোস্ত শুকিয়ে যায় না, তার দেহের কোষগুলো আল্লাহর স্বাভাবিক নিয়মে কিছু মরছে এবং আল্লাহর দেয়া গায়েবী খাদ্যে সে কোষগুলো আবার পূরণ হচ্ছে ..... عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ কিছুটা উদ্ধার করা যায় কি না। তাছাড়া আল্লাহ কুরআন বুঝার জন্যেই নাযিল করেছেন, না বুঝার জন্য নাযিল করেননি। এ প্রসঙ্গে আরো একটা বৈজ্ঞানিক যুক্তি তুলে ধরতে চাই যাতে চিন্তাশীলদের চিন্তার বিকাশ ঘটতে পারে।

www.pathagar.com

আমাদের দুনিয়ার বসতির হাকিকাত

আমরা তো আমাদের মোটা জ্ঞানে বুঝি যে, আমরা যেখানে জন্মেছি সেখানেই সারাজীবন বাস করছি। আমার বাড়ীর জায়গা কখনো সরে নড়ে যাচ্ছে না। কিন্তু কয়জন জানি যে, মহা ফাকার মধ্যে আজ বেলা ১২ টায় মহা ফাকার যে স্থানে অবস্থান করছি আগামীকাল ঠিক বেলা ১২টার সময় পূর্বে দিনের (২৪ ঘন্টার পূর্বের) অবস্থান থেকে ১৭,২৮,০০০ মাইল দূরে থাকব? এবং প্রতি বছর ১লা জুলাই আমরা মহা ফাকার যে স্থানে অবস্থান করি, ৬ মাস পরে ১লা জানুয়ারী তার থেকে ৩১ কোটি মাইল পথ দূরে থাকি এবং প্রত্যেক দিন- দিন ১২ টায় আমরা যেখানে অবস্থান করি অর্থাৎ আকাশের যে অংশটা আমাদের মাথার উপরে থাকে ঠিক আকাশের সেই অংশটাই রাত ১২টার সময় আমেরিকার লোকদের মাথার উপর থাকে। অর্থাৎ আমেরিকায় আমরা না গেলেও প্রতিদিনই ১২ ঘন্টা পর আমেরিকার আকাশটা আমরা দেখে থাকি। এবং লন্ডন আমরা না গেলেও লন্ডনের মানুষ ঠিক তাদের স্থানীয় সময়ের প্রতিদিন সকাল ৬টায় আকাশের যে অংশটা তারা তাদের মাথার উপর দেখে আমরা আকাশের সেই অংশটাই প্রতিদিন তাদের রাত ১২টার সময় আমরা আমাদের মাথার উপর দেখি। আবার প্রতিদিন জাপানের স্থানীয় সময় বেলা ১২টায় আকাশের যে অংশটা তারা তাদের মাথার উপর উপর দেখে আমরা আমাদের স্থানীয় সময় বেলা ১২টায় এবং তারা জাপানের স্থানীয় সময়ের অর্থাৎ জাপানিদের সন্ধ্যা ৬টায় আকাশের সেই অংশটাই আমরা আমাদের মাথার উপর দেখি। এসব যেমন চোখে দেখার ব্যাপার নয় জ্ঞানে দেখার ব্যাপার। ঠিক তদ্রূপই শহীদদের বরযাখী জীবনের অবস্থা চোখে দেখার ব্যাপার নয়, ওটাও ঈমানদার জ্ঞানী লোকের জ্ঞানে দেখার ব্যাপার।

বরযাখী জীবনের আরো কিছু যুক্তিগ্রাহ্য কথা

আমরা ঘুমিয়ে ২/৩ ঘন্টার মতো সময় ধরে এক টানা যে স্বপ্ন দেখি তা দুনিয়ার সময়ের মাত্র ৩ সেকেন্ড (এটা বৈজ্ঞানিকভাবে পরীক্ষিত) যে আল্লাহ মাত্র ৩ সেকেন্ডের মধ্যে ২/৩ ঘন্টার স্বপ্ন দেখাতে পারেন, সেই আল্লাহ মৃত্যুর পর থেকে কোটি কোটি বছর পর্যন্ত সময়কে ৩ সেকেন্ডের মতো সময় মনে

www.pathagar.com

করাতেও সক্ষম । এজন্যেই হযরত উজাইর (আ)-কে ১০০ বছর মৃত অবস্থায় রেখে আল্লাহ যখন তাকে জিন্দা করে জিজ্ঞেস করলেন كَمْ لَبِثْتَ এভাবে তুমি কতদিন ঘুমিয়ে ছিলে? তার জবাবে তিনি বলেন بِثْتَ يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ এভাবে ঘুমিয়ে ছিলাম বা মৃত্যু অবস্থায় ছিলাম মনে হয় পুরা একটা দিনও হতে পারে অথবা দিনের কিছু অংশও হতে পারে। কিন্তু আল্লাহ বলেন, না তুমি ১০০ বছর এ অবস্থায় থাকার পর তোমাকে পুনরায় জীবিত করে উঠান হয়েছে। কাজেই এমনও ব্যবস্থা আল্লাহ কারো কারো ব্যাপারে করতে পারেন যে, কবরের সওয়াল জওয়াবের মতো সময়ও তার জন্যে মিলবে না। বিরাট দীর্ঘ সময়কে তার জন্যে ২/১ মিনিটের মতো সময় করতেও আল্লাহর নিকট অসম্ভব নয়। এ কারণেই আল্লাহ -১৭ পারার শুরুতে সূরা আম্বিয়ার প্রথম আয়াতে বলেছেন-

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِىْ غَفْلَةٍ مُعْرِضُوْنَ ـ

"অতি নিকটে এসে গেছে লোকদের হিসাব নিকাশের সময় অথচ তারা এখনো গাফলতির মধ্যে বিমুখ হয়ে পড়ে রয়েছে।"

এখানে 'অতি নিকটে আসার কথাকে' আর হযরত উযাইর (আ)-এর কথাকে যদি এক সাথে মিলিয়ে চিন্তা করি তাহলে এটাও (এবং হাদীসেও যার সমর্থন রয়েছে) হতে পারে যে, আল্লাহর নবী রসূলগণ ও শহীদ এবং শাহাদাতের মর্যাদাপ্রাপ্ত লোকদের বেলায় আল্লাহ মৃত্যুর পর থেকে পরকালের সময় পর্যন্ত দীর্ঘ সময়কে আল্লাহ অত্যন্ত কম করে দিতে পারেন এবং তাদের কাছে এটাও মনে হতে পারে যে, রাতে তারা এশার নামায পড়ে খেয়ে ১০টার দিকে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম এবং মাত্র রাতের মতো এতটুকু সময় এক নিরাপদ স্থানে ঘুমিয়ে ছিলাম যেখানে ঘুমটা ছিল গরমকালে ও শীতকালে শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে অত্যন্ত নিরাপদ ও অত্যন্ত আরামপদ স্থানে যেন কিছুক্ষণ শান্তির ঘুমে ঘুমিয়ে ছিলাম। এখন হঠাৎ করে জেগে একি দেখছি। এযে সেই কিয়ামতের মাঠ যার কথা ইতিপূর্বে আমরা শুনেছিলাম তখন তাদের অত্যন্ত

فَاَمَّا مَنْ اُوْتِىَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ـ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيْرًا ـ وَ يَنْقَلِبُ اِلٰى اَهْلِهٖ مَسْرُوْرًا ـ

(সূরা ইনশিকাক- ৭, ৮ ও ৯ আয়াত)

www.pathagar.com

"অতপর যাহার ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে। তখন তাদের হিসাব অত্যন্ত সহজভাবে গ্রহণ করা হবে। আর তারা তাদের আপনজনের দিকে আনন্দ চিত্তে ফিরে যাবে।" এখানে আপনজন বলতে তার বেহেশতী সঙ্গি-সাথীদের বুঝতে হবে। আহাল বললেই নিজের পরিবার বুঝায় না, যেমন নূহ (আ)-এর আহালের মধ্যে তার নিজের ছেলে কেনান শামিল ছিল না, কিন্তু নূহ (আ)-এর আহালের মধ্যে সমস্ত বিশ্ববাসীরা শামিল ছিল তেমন এখানেও আহাল বলতে এটাও বুঝাতে পারে যে, দুনিয়ায় যাদের সাথে একই মতাদর্শের ভিত্তিতে একই উদ্দেশ্যে একই সাথে ইসলামের জন্যে কাজ করেছিল তাদের সাথে খুব দ্রুত বেহেশতে দাখিল হয়ে যাবে।

এরপরও কিছু প্রশ্ন থেকে যায় তা হচ্ছে এই যে, যারা শহীদ হবে তারা তাদের বরযাখী জীবনের আরাম-আয়েশ দেখে খুশী হয়ে অপেক্ষা করতে থাকবে তাদের পিছনে পড়া আন্দোলনী দীনি ভাইদের জন্য যে, তারাও যদি তাড়াতাড়ি শহীদ হয়ে এসে পড়ত তবে তারাও আমাদের মতো শান্তি ভোগ করতে পারতো। এ চিন্তা করতে তাদের লাখ লাখ কোটি কোটি বছর সময় লাগার কথা নয়। ৩ সেকেন্ডে যে আল্লাহ ২/৩ ঘন্টার লম্বা স্বপ্ন দেখাতে পারেন, যে আল্লাহ তাঁর নবীকে এক সেকেন্ডেরও কম সময়ের মধ্যে সাত তবক আকাশ সফর করিয়ে প্রায় ২৬/২৭ বছরের মতো সময়কে অত্যন্ত ক্ষুদ্র মুহূর্তের মধ্যে দেখাতে পারেন, সে আল্লাহর কাছে অসম্ভব বলে কোনো জিনিস কি থাকতে পারে? তা অবশ্যই পারে না। এরপরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে, শহীদ হওয়ার সাথে সাথে কি শহীদ ব্যক্তি বিচারের পূর্বেই কি বেহেশতে গিয়ে বেহেশতি আরাম ভোগ করতে পারে? এরও জবাব কুরআন থেকে আমরা নিতে পারি। কিন্তু এ কথায় বিশ্বাসস্থাপন করাও ঈমানদারদের জন্যে কোনো কঠিন নয় যে, বেহেশতের বাইরে আল্লাহ মাকামে ইল্লিনে এমন স্থানে শহীদদের এবং নবীগণকে রাখতে পারেন যেখানের শান্তি বেহেশতের শান্তির ন্যায়ই।

যা বলতে চাচ্ছিলাম, তা হচ্ছে সূরা ইয়াসিনের ২৬ ও ২৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলছেন .....

قِيْلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِيْ يَعْلَمُوْنَ - بِمَا غَفَرَلِيْ رَبِّيْ وَجَعَلَنِيْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ -

"(শেষ পর্যন্ত তারা সেই ব্যক্তি যার নামে অনেকেই বলেছেন হাবিবে নাজ্জার তাকে যখন শহীদ করল অতপর তাকে) "বলা হল প্রবেশ কর বা ঢুকে

www.pathagar.com

পড় জান্নাতে, সে বলল হায় আমার জাতি যদি জানতে পারতো (যে আমাকে মেরে তারা আমার মর্যাদা কত বৃদ্ধি করে দিল তাহলে কতই না ভুল হতো কিন্তু এ আশা অর্থাৎ তার জাতিকে তার অবস্থা দেখান তার পক্ষে অসম্ভব ছিল) যে আমার রব কিসের কারণে আমাকে ক্ষমা করে দিলেন (তাতো জান দেয়ার কারণেই ছিল) এবং আমাকে মহা সম্মানিত লোকদের মধ্যে গণ্য করলেন। "এ আয়াত থেকে তো বুঝা যায় যে, ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করার সাথে সাথেই বলা হয়েছিল বেহেশতে ঢুকে পড়। এর দ্বারা দুই প্রকার কথাই বুঝা যায়, যে প্রকৃত বেহেশতেই তাকে প্রবেশ করান হয়েছিল। এছাড়া এটাও বলা চলে যে, যেখানে প্রবেশ করান হয়েছিল তা বেহেশতেরই অনুরূপ বা অংশবিশেষ। এ ছাড়াও তো সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণিত যে, রসূলে পাক ﷺ যখন মেরাজে যাচ্ছিলেন তখন পথিমধ্যে একটা সুগন্ধ পেয়ে হযরত জিবরাইল (আ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, এটা কিসের খোশবু জবাবে জিবরাঈল (আ) বললেন, এটা ফেরাউনের মেয়ে শহীদা মাশেতা এবং তাঁর শহীদ সন্তানদের গায়ের খোশবু যাদেরকে ইসলাম গ্রহণ করার কারণে পিতা ফেরাউন তার মেয়ে মাশেতাকে ও তাঁর সন্তানদের গরম তেলের মধ্যে ফেলে দিয়ে জিলেপী ভাজার মতো ভেজে মেরেছিল সেইসব শহীদদের গায়ের খোশবু বেহেশত থেকে আসছে। এতে একথা মানতে কোনো আপত্তি থাকে না যে, শহীদদের আল্লাহ বিচারের মাঠে হাজির নাও করতে পারেন। তাদের সরাসরি বেহেশতের মধ্যে চির যৌবন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখতে পারেন এবং বেহেশতি খাদ্য যা আল কুরআনের বহুস্থানে উল্লেখ আছে তাও দিতে পারেন। আল্লাহর জন্যে এর কোনোটাই অসম্ভব নয়। এখন প্রশ্ন আমরা বিশ্বাস করব কোন্‌টা? এর জবাব এক কথায় এই যে, আল্লাহ বলছেন - সে সম্পর্কে لَا تَشْعُرُوْنَ তোমাদের কোনো অনুভূতি নেই। ব্যাস আল্লাহর কথাই বিশ্বাসস্থাপন করলাম এবং আল্লাহ দয়া করলে বরযাখী জীবনেই তা অনুভব করব। তবে শহীদদের ন্যায় তা বুঝতে হলে শহীদি মরা মরতে হবে। আর শহীদি মরা মরতে হলে কমপক্ষে ৬টি কাজে নিজেকে লিপ্ত রাখতে হবে যথা–

১। ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত ঠিকমত পালন এবং নফল ইবাদাত বেশী করে আল্লাহর সাথে নিজের মনের বা আত্মার সম্পর্ক দৃঢ় করতে হবে।

২। যাবতীয় হারাম ও মাকরূহ কাজ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে হবে।

৩। লোকদেরকে বেহেশতের পথ দেখানোর জন্যে মানুষের মধ্যে দাওয়াতী কাজ সর্বক্ষণ চালু রাখতে হবে।

www.pathagar.com

৪। আল্লাহর আইন ও সৎলোকের শাসন কায়েমের সংগ্রামে নিজেকে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ছাত্র হই বা অছাত্র হই, পুরুষ হই বা মহিলা হই নিজেকে ইসলামী আন্দোলনের সাথে জুড়ে রাখতে হবে এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের সাধনায় সর্বদা লিপ্ত থাকতে হবে।

৫। এতে শয়তান বিভিন্ন পন্থায় মনের মধ্যে ওয়াসওয়াসা দেবে কিন্তু কুরআন হাদীস থেকে জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে নিজেকে শয়তানি ওয়াসওয়াসা থেকে হেফাজত রাখতে হবে।

৬। মনে মনে হুশিয়ার থাকতে হবে যেন উপরোক্ত কাজগুলো যথাযথভাবে সম্পন্ন করার সাধনায় লিপ্ত থাকা অবস্থায় মরতে পারি। তাহলে যে ধরনের মৃত্যুই হোক না কেন এতে তার অবশ্যই শহীদি মৃত্যু হবে। এটা আমার নিজের মন থেকে বলছি না, বলছি কুরআন হাদীস থেকে। এ পর্যন্ত যেটুকু বুঝ বুঝেছি এবং যে বুঝের মধ্যে আমার মনে কোনো অস্পষ্টতা নেই বলে আমি মনে করি সেই বুঝ মুতাবিকই বলছি যা আমার আল্লাহই ভাল জানেন।

কারবালার ঘটনার পরবর্তী অবস্থা

কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার পরবর্তী ঘটনা অনেকেরই জানা, কাজেই মানুষ যেটুকু ভাল জানে বলে আমার বিশ্বাস তা লিখে বই ভারী করা আমার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য এরপরও এমন একটা ঘটনা ঘটেছিল যার মধ্যে আমাদের জন্যে রয়েছে এক চরম শিক্ষা। ঐ শিক্ষাটাই আমি এখানে তুলে ধরতে চাই। তা হচ্ছে পরে ইমামের পরিবার পরিজনকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়া হল দামেস্কে। এক সপ্তাহ পরে এলো আর এক শুক্রবার সে হল যে শুক্রবারে হযরত ইমাম হুসাইন (রা) শহীদ হলেন। তারই পরবর্তী শুক্রবার মুসল্লিরা এলেন জুমার নামায পড়তে। ইমাম বংশের অর্থাৎ রসূল ﷺ -এর বংশের শেষ পুরুষ সন্তান হযরত জয়নুল আবেদীন হাজির হলেন জুমার নামায আদায় করতে দামেস্কের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে। যার খতীব জুমার নামাযের ইমাম হচ্ছে তৎকালীন অবৈধ খলিফা ইয়াজিদ।

এখন প্রশ্ন দেখা দিল যে, আজ ইমাম বংশের ছেলে যেখানে উপস্থিত সেখানে জুমার নামাযের ইমাম হবেন কে এবং খুতবা বা ভাষণ দিবেন কে? সিদ্ধান্ত হলো, ইমাম বংশের বা খোদ রসূলের বংশের হযরত জয়নুল আবেদীন যেখানে উপস্থিত সেখানে আর কারো ইমামতিই চলবে না। সিদ্ধান্ত মুতাবিক

www.pathagar.com

ইয়াজিদ হল মুক্তাদি আর হযরত জয়নুল আবেদীন হলেন ইমাম। এবার তিনি খুতবা দিতে উঠবেন। তখন পাশের একজন সম্ভ্রান্ত বুজর্গ ব্যক্তি হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের কানে কানে বলে দিলেন যে, দেখ তুমি রসূলের বংশের একমাত্র সন্তান, কাজেই আমরা চাই যে, রসূলের বংশ চির তরে ধ্বংস না হয়ে তা টিকে থাকুক। তাই তোমাকে অতি বিনয়ের সাথে অনুরোধ করছি তুমি শেষ খুতবায় রীতি অনুযায়ী খলিফা ইয়াজিদের নামটা উচ্চারণ করো। তিনি খুতবা দিতে উঠেই ব্যাখ্যা করে বলেন যে, কেন ইমাম হুসাইন (রা) অবৈধ খেলাফতির স্বীকৃতি দিতে পারেননি। মানুষ যা বুঝতো না, তা সেদিন তারা বুঝল। তিনি বললেন, এ মাত্র গত শুক্রবারে কারবালার মাঠে আমার পূর্ব পুরুষ রক্তাক্ষরে লিখে গেলেন যে ফতোয়া, আমি কি তা অমান্য করে ইয়াজিদকে জুমার খুতবার মাধ্যমে খলিফা বলে স্বীকার করতে পারি? তা পারি না। তিনি ইয়াজিদকে খুতবার মাধ্যমে খলিফা বলে স্বীকার করলেন না। কারণ এক সপ্তাহ পূর্বেই তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমরা মরতে প্রস্তুত আছি কিন্তু খিলাফত ছাড়া ইসলাম যে অন্য কোনো ধরনেরই রাষ্ট্রব্যবস্থা স্বীকার করতে পারে না, রক্ত দিয়েই তার সাক্ষর রেখে যাব দুনিয়ায়। সেই সিদ্ধান্ত মুতাবিকই ইমাম হুসাইন (রা) তাঁর দেহের সবটুকু রক্ত ঢেলে দিয়ে কারবালার মাঠে লিখে গেলেন যে ফতোয়া, আমারও সেই একই ফতোয়া যে, খিলাফত ছাড়া ইসলাম মানে না কোনো শাসন ব্যবস্থাই। আমরা বন্দি প্রত্যেকেই সেই সিদ্ধান্তের পর অটল রয়েছি যদিও বন্দী অবস্থায়। কিন্তু সিদ্ধান্তে রয়েছি অটল। এরপর উপস্থিত মুসলমান যাদের বুঝ অস্পষ্ট ছিল তারা পরিষ্কার বুঝলেন যে, কেন ইমাম হুসাইন (রা) জান দিয়েছেন কিন্তু ইয়াজিদের খিলাফতির স্বীকৃতি দেননি। এটা ছিল জয়নাল আবেদীনের জুমার ভাষণ।

প্রিয় পাঠক পাঠিকা ভাই ও বোনেরা এর মধ্যে আছে কি আমাদের জন্যে কোনো শিক্ষা?

– ঃ সমাপ্ত ঃ –

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেজেটরির জাতীয় আদর্শ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১-১৯৬৬২২৯
০১৯২-৪৭৩৩৮১৫